মোগল হারেম

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব





সাহিত্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ইতিহাস কখনো সাহিত্য হয় না। সে কারণে ইতিহাস সাহিত্যের মতো পাঠককে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে কিংবা ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে মুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম হয় না। ভাষার মাধুর্যতা, রূপ-রসের মাদকতা কিংবা উপস্থাপন ভঙ্গিকে আকর্ষনীয় ঢঙে রূপায়নের জন্য বিষয়ের অতিরঞ্জনও ইতিহাস গ্রহণ করে না। তাই ইতিহাস হয় নির্মোহ ও নিরস প্রকৃতির। ইতিহাস পাঠ করা হয় প্রয়োজনে, রস আস্বাদনের জন্যে নয়। যে কারণে ইতিহাসের পাঠকও অনেকটা নির্মোহ ও অতিকথন মুক্ত সঠিক তথ্য সম্বলিত ইতিহাসই খোঁজেন।

হারেম বা হেরেম শব্দটি আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয় নিয়ে নানা কল্পকথাও ছড়িয়ে আছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। বিশেষ করে মোগল আমলের হারেমকে ঘিরে নানা রঙের মুখরোচক কথা-বার্তা ছড়িয়ে আছে আমাদের গল্পে, নাটকে, কবিতায় এমনকি ইতিহাসের মোড়কে আবৃত বিভিন্ন গ্রন্থে। বিষয়টিকে নিয়ে কল্পনাপ্রসূত নানা রকমের মুখরোচক গল্পকে ইতিহাসের মোড়কে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াসও লক্ষ্য করা গেছে আমাদের সমাজে। অথচ গবেষণা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক পন্থায় উৎস-উপাত্তের অনুসন্ধান করতে গেলে তার সিংহভাগই হয়তো অতিকথন বা বানোয়াট তথ্যসম্ভার বলেই বিবেচিত হবে।

মোগল হারেম

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব



মোগল হারেম
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব



প্রকাশক	□	পরিলেখ
		ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক, রাণীনগর
		ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
প্রথম প্রকাশ	□	একুশে বইমেলা ২০১৫
গ্রন্থ স্বত্ব	□	আয়েশা ছিদ্দিকা আলপনা
প্রচ্ছদ	□	কে এস লাল এর *দি মোগল হারেম*
		গ্রন্থে মোগল চিত্রকলা অবলম্বনে মোহন ইসলাম
অক্ষরসজ্জা	□	আল-আকাবা কম্পিউটার
		এ আর ম্যানশন, প্রেসপট্টি, বগুড়া
মুদ্রণ	□	প্রেস লাইন অফসেট প্রিন্টি প্রেস
		ময়েন উদ্দিন প্লাজা, ২য় তলা, প্রেসপট্টি, বগুড়া
মূল্য	□	দুইশত টাকা

MUGHAL HAREM
ITIHAS O OITIZZO
by
MD. ABDUL WAHAB
Published by Porilekh, Oisik, Abdul Huq Road, Raninagar
Ghoramara, Rajshahi, Bangladesh, Cover: Mohon Islam
February 2015 Price : TK. 200.00 only

ISBN-978-984-8867-75-4

সূচিপত্র

উৎসর্গ

"ধরার মাঝে এসে আমি
পেলাম প্রথম যাকে
প্রয়াস খানি দিলাম তুলে
সেই বাবা মাকে"

বাবা আলহাজ্ব জহুদার রহমান মাস্টার
মা মোছাঃ মনোয়ারা বেগম
এবং
আমার একমাত্র পুত্র
আহ্‌মাদ তাকী আবির
কে

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা মহান প্রভূর দরবারে; যার একান্ত কৃপায় এই গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হলো। দরূদ ও সালাম মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি। স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ এবং প্রফেসর মোঃ এহসান আলী কে; যাদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগীতায় আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশনা ও সহযোগিতা, অধ্যায় বিন্যাস, সর্বোপরি গবেষণা কর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সঠিকভাবে সাজানোর ক্ষেত্রে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ এর সার্বক্ষণিক সময়দান ও নির্দেশনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তার ঐকান্তিক চেষ্টা, সহযোগিতা ও বন্ধুসুলভ ভালবাসার কারণে আমার গবেষণা কর্মে সকল বাঁধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সহ-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মোঃ এহসান আলীর সহযোগিতার ফলে আমার গবেষণা কর্ম শুরু এবং শেষ করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ গবেষণা কাজে তাদের সহযোগিতা চিরদিন স্মরণযোগ্য।

ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনামল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সবারই রয়েছে। ভারতের মোগলরা ছিল চাগতাই তুর্কি। সম্রাট বাবর ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ইব্রাহীম লোদিকে পরাজিত করে ভারতে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশই মোগল নামে পরিচিত।

আরবি হারিম শব্দের তুর্কি রূপ হারেম (Harem), হেরেম অথবা হারিম। তুর্কি হারেম শব্দের অর্থ বাসগৃহ, অন্দরমহল, নারী নিবাস প্রভৃতি। মোগল শাসন আমলে রাজপ্রাসাদের যে অংশে মেয়েদের আলাদা করে রাখা হতো তাকে হারেম বা হারিম বলা হতো। পারস্য ও গ্রীকদের থেকে মুসলিম শাসকেরা হারেম সংস্কৃতির ধারণা লাভ করে। উমাইয়া শাসন আমল হতে হারেম প্রথার সূচনা হলেও ভারতের মোগল শাসকেরা এর কাঠামোগত রূপ দেন। মোগল সম্রাট আকবর ছিলেন মূলত হারেম প্রথার জনক।

মোগল হারেম সম্পর্কে ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রচুর উৎসুক্য ছিল। এসব পর্যটকদের অনেকে ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। কাহিনী নির্ভর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব কল্পিত বিবরণে মোগল বেগম ও শাহজাদীদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে। এবং ঐসব বিবরণ ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের বিতর্কিত তথ্যসমূহের সত্যতা যাচাই না করে মোগল হারেম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও কল্পনার রঙ লাগানোর

প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে মোগল হারেম বা জানানা মহল ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। হারেমে খোঁজা প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে মোগল সম্রাট ছাড়া পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না।

মোগল সম্রাটগণ অনেকেই নিজেদের আত্মজীবনী লিখে গেছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণও তাদের দরবারী ইতিহাস রচনা করে গেছেন। এসব ফার্সী ও তুর্কি ভাষায় লেখা সমকালীন ইতিহাসে মোগল বেগম ও শাহজাদীদের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও মোগল চিত্রকলায় মূল্যবান ছবিতে হারেমের অনেক ধারণা পাওয়া যায়। মোটকথা মোগল হারেমের সঠিক চিত্র নির্ণয়ের উপাদানের কোন অভাব ছিলনা। কিন্তু তার সঠিক ব্যবহার না করে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মোগল হামেরমের চিত্র রূপকথার গল্পের মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে মোগল সম্রাটদের সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতিহাসও বিকৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই মোগল হারেম সম্পর্কে নীতিবাচক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির আলোকে এসব কল্প কাহিনী ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। তাই এ গবেষণায় মোগল হারেম সম্পর্কে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যগুলোকে ইতিহাস গবেষণার পদ্ধতির আলোকে যাচাই করে মোগল হারেম সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোগল শাসন আমলে হারেমে নারীর অবস্থান সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে আরও যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তারা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ বি এম হোসেন, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, প্রফেসর ড. মো. মোখলেছুর রহমান, প্রফেসর ড. এম. এ বারী, প্রফেসর ড. সুলতান আহমেদ, প্রফেসর ড. এবিএম শাহজাহান, প্রফেসর ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, প্রফেসর ড. মো. আজিজুল হক, প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হক, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, প্রফেসর ড. মুন্সী মুঞ্জুরুল হক, প্রফেসর ড. মো. ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রফেসর ড. দিলশাদ আরা বুলুসহ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সকল শিক্ষক মন্ডলী। তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রফেসর ড. মো. নিজাম উদ্দীন, প্রফেসর ড. মো. আবদুল হান্নান, ড. গোলাম কিবরিয়া ফেরদৌস, প্রফেসর ড. মো. কামাল উদ্দীন এ গ্রন্থ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি নুনগোলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মাহবুবুর রহমানকে; যিনি আমার গবেষণা কাজে শিক্ষাছুটির ব্যবস্থা, সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সেইসাথে কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপাধ্যক্ষ নূরুল আলমসহ কলেজের সকল শিক্ষক মণ্ডলীকে স্মরণ করছি। বিশেষভাবে কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম কে ধন্যবাদ জানাই যিনি আমাকে গবেষণা কাজে নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া সহকারী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল খালেক, মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ড. মোখলেসুর রহমান, প্রভাষক মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক মিলন মিয়া সরকার আমার এ কাজে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণ করছি দৈনিক 'সাতমাথা' বগুড়া'র সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, সাংবাদিক মহসীন আলী রাজু, এফ শাহজাহান, মোস্তফা মোঘল, আব্দুল ওয়াদুদ, প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক আব্দুল মতিন, প্রভাষক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সৈয়দ মোস্তফা কামাল এবং মাজেদুর রহমান জুয়েল, রহমান তাওহীদ, আব্দুল আউয়াল, সাজিদ হাসানসহ যারা আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ খবর নিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, এ জন্য আমি তাদের কাছে ঋণী। এছাড়া গবেষক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, এ কে এম আমিনুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদসহ সকলের সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি।

আমার পিতা আলহাজ্ব জহুদার রহমান মাস্টার, মাতা মোছাঃ মনোয়ারা বেগম যাদের ত্যাগের বিনিময়ে এই পৃথিবীতে আমার আসা এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ; তাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার ছোট ভাই ড. মো. মোজাম্মেল হক, বড় ভগ্নিপতি ইঞ্জিনিয়ার জাহেদুল ইসলাম, বোন নুরবানু ইসলাম, হোসনে আরা বেগম, জাবিউন নেসা, বড় ভাবী সুলতানা রাজিয়া, বড় ভাই আব্দুল ওয়াদুদ, শ্যালক ড. রেজওয়ানুল করিম, আবু রায়হান হিরু, শ্যালক স্ত্রী হাসনা, রত্না ও শ্বশুর-শাশুড়ী সহ পরিবারের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্মরণ করছি আমার সুপারভাইজারের সহধর্মিনি নাজমা আখন্দ ভাবীকে, যিনি আমাকে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য বারবার তাকিদ দিয়েছেন, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার সহধর্মিনি মোছাঃ আয়েশা ছিদ্দিকাকে, যার প্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি শেষ পর্যন্ত কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। সেই সাথে আমার একমাত্র পুত্র সন্তান আহমাদ তাকী আবির এর প্রতি রইল পরম স্নেহ, দরদ ও ভালবাসা।

এছাড়াও গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগার, আইবিএস গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি

অব বাংলাদেশ গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ও লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার বগুড়া, ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ পাঠাগার বগুড়া, সরকারী গণগ্রন্থাগার বগুড়া, উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরী বগুড়া, প্রেসক্লাব পাঠাগার বগুড়া, নুনগোলা ডিগ্রী কলেজ লাইব্রেরী বগুড়া প্রভৃতি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই গ্রন্থ রচনায় বাংলা, ইংরেজি, আরবি গ্রন্থাদি, আধুনিক ইতিহাসবিদদের লিখিত পুস্তক, বিভিন্ন জার্নাল, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ থেকে মূল্যবান তথ্য উপাত্ত নেয়া হয়েছে তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি প্রকাশে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে পরিলেখ প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করে আমার এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বইটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এর পরেও কারো নজরে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে তা জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

প্রবাহমান মানব জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। প্রাকৃতিক ভিন্নতা ব্যতীত নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই। স্থান-কাল পাত্র ভেদে নারীর কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও ইসলাম নারীকে তার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে এবং নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসেই নির্মিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাস। মোগল নারীরা হারেমে কঠোর পর্দার মধ্যে জীবন যাপন করেও তাদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সমকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ১৫২৬ হতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সম্রাটগণ দীর্ঘ সময় ভারত শাসন করেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে তাদের এ শাসনকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোগল আমলে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও রাজ্যশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল তার পিছনে মোগল হারেমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

আরবি হারিম (حريم) শব্দের অর্থ এ রূপ ব্যক্তি বা বস্তু যাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। হারিম রাজ-প্রাসাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী এরূপ স্থান বা সীমারেখাকে বলা হয়, যেখানে প্রবেশ করা সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ। অতএব একে বহিরাগত হতে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরবি হারিম শব্দরই তুর্কি রূপ 'হারিম' বা 'হারেম'।

হারেম ছিল মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। মোগল রাজপ্রাসাদের যে অংশে সম্রাটগণের স্ত্রী, কন্যা, মা-বোন, মহিলা কর্মচারী ও উপপত্নীগণ বাস করতেন তা হারেম নামে পরিচিত ছিল। মহিলাদের এ আবাসস্থলগুলোকে (Female Apartment) বা মহল বলা হতো। মোগল বেগমগণ হারেমে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের নির্দেশেই হারেমের সবকিছু পরিচালিত হতো। হিন্দু বেগমদের জন্যও হারেমে আলাদা মহল ছিল। সেখানে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস ও নিজেদের ধর্ম পালন করতেন।

মোগলরা ছিলেন চাগতাই তুর্কি। তুর্কি বীর তৈমুর লং ও মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এর বংশধর। মধ্য এশিয়ায় বসবাসকালে তুর্কিদের সাথে মোঙ্গলদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং সর্বপ্রথম ভারত আক্রমণ করে সফল হন। পরবর্তীতে সেই সূত্র ধরে তারই বংশধর জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশই ইতিহাসে মোগল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সম্রাট বাবর ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭জন মোগল শাসক কর্তৃক ভারত শাসিত হয়েছিল এদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক; তারা হলেন-বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব।

মোগল আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিকাশে হারেমের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। মোগল হারেমে অবস্থানকারী নারীরা রাজকার্য, জ্ঞানচর্চা, শিল্পকলাসহ সকল ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করতেন। সম্রাট হুমায়ন হতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সমস্ত শাসকদের উপর নারীদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। হারেমের নারীরা পর্দার আড়ালে থেকেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতেন। তারা শুধুমাত্র পুরুষদের বিলাস উপাদান হিসেবেই জীবন কাটাননি বরং শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা দ্বারা নারী জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন। ইরান তুরানসহ নানা দেশের মোগল সুশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না নারীদের সমাবেশ মোগল হারেমে এক বৈচিত্রময় পরিবেশ তৈরী করেছিল। যেসব মহীয়সী নারী হারেমে অবস্থান করে রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- গুলবদন বেগম, সেলিমা সুলতান বেগম, মাহম আনগা, মেহের উন নিসা ওরফে নূরজাহান, আরজুমান বানু ওরফে মমতাজ মহল, জাহান আরা, জেব উন নিসা প্রমূখ।

গুলবদন বেগম সম্রাট বাবরের কন্যা। তিনি বাবর, হুমায়ন ও আকবরের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। চারিত্রিক পবিত্রতা, দানশীলতা ও জ্ঞান গরিমায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'হুমায়ন নামা' নামে একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ফার্সী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে তিনি প্রথম তিনজন মোগল সম্রাটের রাজ্য শাসনসহ নানা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এছাড়া তিনি ফার্সী ভাষায় কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার গর্ভে এক ছেলে এবং এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সম্রাট আকবরের সময় এ মহীয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।

হারেমের অন্যতম বিশেষ খ্যাতিমান নারী সেলিমা সুলতান বেগম। আকবরের হারেমে তিনি অদ্বিতীয়া রমনী ছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, সুচতুরা ও বাকপটু এ নারী হুমায়নের বৈমাত্রেয় ভগ্নী গুলগাদারের কন্যা ছিলেন। সম্রাট হুমায়নের সেনাপতি বৈরাম খানের সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের মাত্র ৩ বছর পরেই বৈরাম খানের মৃত্যু হলে আকবর তাকে বিবাহ করেন। জ্ঞানের প্রতি এই বিদুষী মহিলার প্রচন্ড আগ্রহ ছিল এবং তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি 'মাখফি' (Concealed) বা লুক্কায়িত ছদ্মনামে কবিতা রচনা করেছেন। তার বিশেষ গুণের জন্য তাকে 'খাদিজা- উজ- জামিনী' উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিল।

মোগল ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমধর্মী নারী নূরজাহান। তার আসল নাম মেহের উন নিসা। তার পিতা মির্জা গিয়াস বেগ মোগল রাজদরবারের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তৎকালীন বাংলার বর্ধমানের জায়গিরদার আলী কুলি বেগের সাথে প্রথম বিয়ে হয়। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিদ্রোহ করলে বাংলার শাসনকর্তা

কুতুবউদ্দিনের সাথে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। পরবর্তীকালে আকবরের পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর তাকে বিবাহ করে নূরজাহান বা জগতের আলো উপাধীতে ভূষিত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তখন থেকে জাহাঙ্গীর নূরজাহানের হাতের ক্রীড়নক হয়ে ওঠেন। রাজ্য শাসনসহ সকল ব্যাপারই নূরজাহানের হাতে পরিচালিত হত। এই বিদূষী নারী অতিশয় দয়াবতি ও প্রজা সাধারণের মঙ্গল চিন্তা করতেন। তিনি নিজ খরচে ৫'শ এতিম দরিদ্র বালিকার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। ললিত শিল্পকলায় তার হাতের ছোঁয়ায় মোগল হারেম এক নতুন রূপ লাভ করে। নানা রুচির স্বর্ণালঙ্কার ও পোষাকে নূরজাহান অতুলনীয় সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আপাদলম্বিত নিচোল ও ওড়নার ব্যবহার তিনিই প্রবর্তন করেন। নূরজাহান সঙ্গীত চর্চাও করতেন। তার সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত যে কেউ শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত। কবিতা রচনা ছাড়াও তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

মমতাজ মহল মোগল হারেমের আরো একজন সৌন্দর্যশালিনী নারী। আসল নাম আরজুমান্দ বানু। তিনি মোগল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী; রূপে গুণে অসাধারণ এক রমণী। অত্যন্ত স্বামীভক্ত ও ধর্মানুরাগিনী এ নারী সম্রাট শাহজাহানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাকে 'মালিক-ই-জামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। মমতাজের মৃত্যুর পরে শাহজাহান তার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে তাজমহল নির্মাণ করেন।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যৈষ্ঠ্যা কন্যা জাহান আরা অসাধারণ রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মমতাজ মহলের গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। অতি ছোট বেলা থেকে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হয়। ফার্সী ভাষা ও ধর্মতত্ত্বে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি সাহিত্য সাধনা, গবেষণা, প্রবন্ধ রচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 'রিসালা-ই-সাহাবীয়া', 'মুনিস উল আরওয়া' নামক গ্রন্থদ্বয় তার রচনা। জাহান আরা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাকে দিল্লীর শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুর পর তাকে 'সাহিবৎ-উজ-জামানি' উপাধী প্রদান করেন ।

আওরঙ্গজেবের প্রথমা কন্যা জেব উন নিসা। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্না এ নারী একাধারে ছিলেন কবি, শিল্পী, ও দানশীলা। জেব উন নিসা দিলরাজ বানুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি সম্পুর্ন কোরআন শরীফ মুখস্ত করেছিলেন। এতে বাবা আওরঙ্গজেব খুশি হয়ে তাকে ৩০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দেন। জেব উন নিসা খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। জ্ঞান চর্চা ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য সাধনা, ইতিহাস ও কবিতা চর্চাতেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তিনি 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' এর ফার্সী অনুবাদ করেন। মূলত এ সব মহীয়সী নারীরাই মোগল হারেমে ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ভারতীয় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে মোগল শাসনামল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মোগলদের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা হলেও মোগল হারেমে নারীর ভূমিকা বা মোগল শাসনামলে নারীর প্রভাবের উপর বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কল্পকাহিনীর উপস্থাপন ছাড়া তেমন কোন মৌলিক গবেষণা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সঠিক ইতিহাস উদঘাটন হওয়া প্রয়োজন।

মধ্যযুগে ভারতীয় মুসলিম শাসনামলে মোগল নারীগণ শাসক গোষ্ঠীর উপর কি ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ঐ সময় নারীরা কি ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছিল সে বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে।

মোগল শাসনামলে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি-শিল্পকলা ও স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল এর পিছনে মোগল হারেমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। মোগল হারেমে নারীরা শুধুমাত্র বিলাসী জীবন যাপন করতো না, তারা জ্ঞান চর্চা, শিল্প সংস্কৃতিও চর্চা করতো। সেই সাথে মোগল হারেমে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কারণে মানব জীবনে হারেমের যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল তা ব্যাপক গবেষণার দাবী রাখে।

উপর্যুক্ত পটভূমির প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, মোগলদের ভারত শাসনের ইতিহাসে মোগল হারেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের শাসনামলে শিক্ষা-সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সমাজের বা হারেমের প্রভাব ছিল উল্লেখ করার মত।

মোগল যুগের দরবারী ইতিহাস সম্রাটগণ নিজে এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ রচনা করে গেছেন। তাদের লেখনীতে মোগল হারেমের বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু অধ্যাবধি বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয়না। মোগল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লিখে গেছেন। হুমায়নের রাজত্বকাল সম্পর্কে ভগ্নী গুলবদন বেগম বিস্তারিত লিখেছেন। আকবরের শাসনকালে তার পৃষ্ঠপোষকতায় আবুল ফজল তার দরবারী ইতিহাস রচনা করে গেছেন। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনকালের বিবরণও সমকালীন ঐতিহাসিকগণ রচনা করে গেছেন। বাবর রচিত *বাবুরনামা*, গুলবদন বেগম রচিত *হুমায়ননামা*, জওহর আফতাবচী রচিত *তাজকিরাতুল ওয়াকেয়াত*, আবুল ফজল রচিত *আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী*, আব্দুল কাদের বদায়ুনী রচিত *মুনতাখাব-উত-তাওয়ারীখ*, জাহাঙ্গীর রচিত *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী*, আব্দুল

হামিদ লাহোরীর রচিত *পাদশানামা* প্রভৃতি আরবি, ফার্সী ও তুর্কি ভাষায় রচিত এ সব গ্রন্থে সমকালীন মোগল ইতিহাস, বেগম, শাহজাদী ও হারেমের মহীয়সীগণের বিবরণ পাওয়া যায়।

মোগল শাসনামলে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তারা হলেন উইলিয়াম হকিন্স (১৬০১-১৬১২), স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৬১৯). ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের (১৬৫৯-১৬৬৬), টার্ভেনিয়ার (১৬৪০-১৬৬৭), ডা. ফ্রায়ার (১৬৭২-১৬৮১) এবং নিকোলাও মানুচি (১৬৫৩-১৭০৮) ও উইলিয়াম ফস্টার প্রমুখ পর্যটকদের রচিত বিবরণীতে সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও পরবর্তীকালে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাদের মূল্যবান রচনাবলীর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

মোগলরা দীর্ঘসময় ভারত শাসন করলেও আওরঙ্গজেবই সর্বশেষ সফল শাসক হিসেবে তার শাসনকালের সমাপ্তি করেছেন। সম্রাট বাবর হতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সময়কালে হারেমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহীয়সী নারীদের তৎপরতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। এ সময়েই মূলত হারেমের মহীয়সীগন মোগল সম্রাটদের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সমাজ, অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বর্তমান গবেষণাকর্মে এ সময়কালের মহীয়সীদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আওরঙ্গজেব পরবর্তী হারেমে তেমন কোন মহীয়সী নারীর অবদান পরিলক্ষিত হয়না। এ সংক্রান্ত তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সময়ে মোগল হারেমের ইতিহাস বিনির্মাণ অনেকাংশে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

মোগল সম্রাটগণ অনেকেই নিজেদের আত্মজীবনী লিখেছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাদের দরবারী ইতিহাস রচনা করে গেছেন। এছাড়াও হারেমে নারীর প্রভাবের উপর বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হারেমের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও হারেমের নারীদের উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রণীত গ্রন্থ ও প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Methods) অনুসরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মোগল হারেমের প্রভাব সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোগল হারেম: সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনামল (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর[১] ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ বংশের শাসকগণ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়ে সাম্রাজ্যকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করেছিলেন। তারা ছিলেন সাহসী, বীর যোদ্ধা, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও উদারমনোভাবাপন্ন শাসক। তবে সবাই তারা খ্যাতিমান শাসক ছিলেন না। বাবরের শাসনামল থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনকাল (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত মোগল শাসনকাল ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

মোগল বংশ: পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট

ভারতবর্ষে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই সাধারণভাবে মোগল বংশ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে কোন কোন ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, এই বংশের নাম মোগল বংশ হওয়া যথার্থ নয়।[২] তবে মোগল শব্দটি এসেছে মোঙ্গল শব্দ থেকে আর মোঙ্গ হতে মোঙ্গল শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ নির্ভীক ও সাহসী। পারস্যবাসীরা প্রথমত মোঙ্গলদের মোগল বলে অভিহিত করতো। পরবর্তীতে সেই সূত্র ধরে প্রধানত ইউরোপীয়রাই তাদের মোগল নামে বিশ্বদরবারে পরিচিত করে তোলেন। মোগলরা নিজে কখনো উক্ত শব্দটি নিজেদের জন্য ব্যবহার করেনি। তবে তারা চেঙ্গিস খান এবং তৈমুর লং এর বংশধর হিসেবে গর্ব অনুভব করতেন। তারা বিশেষভাবে তৈমুরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন।[৩] বাবর মোঙ্গল বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি ছিলেন চাগতাই তুর্কি। মধ্য এশিয়ার দুই সমরনায়ক তুর্কি বীর তৈমুর লং এবং মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান ছিলেন তার উত্তরপুরুষ। পিতার দিক থেকে বাবর ছিলেন তৈমুর লং এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আর মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা তৈমুরের বংশধর ছিলেন এবং তার মাতা কুতলুগ নিগার খানম মোঙ্গল নেতা ইউনুছ খানের কন্যা ছিলেন।[৪] সুতরাং মাতার দিক থেকে বাবর মোগলদের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

মোগল বংশের সাথে মোঙ্গলদের সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হলেও বংশগত ভাবে তারা মোঙ্গল ছিলেন না। তারা ছিলেন তুর্কি। বাবর নিজেও মোঙ্গলদের ঘৃণা করতেন। বাবর পৈত্রিক দিক থেকে চেঙ্গিস খানের সরাসরি বংশধর ছিলেন না। এ জন্যই তারা নিজেদের মোগল, মোঙ্গল বা খান হিসেবে অভিহিত করতেন না। বাবরের বংশ পরম্পরা ছিল- বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা, তার পিতা আবু সাঈদ মির্জা, তার পিতা সুলতান মুহাম্মদ, তার পিতা মীরন শাহ, তার পিতা তাইমুর লং। বাবরের মাতা কুতলুগ নিগার খানম মোঙ্গল নেতা ইউনুস খানের কন্যা ছিলেন। তার বংশ পরম্পরা ছিল- ইউনুস

খানের পিতা ওয়ায়েস খান, তাঁর পিতা শেরআলী ওগলান, তাঁর পিতা মুহাম্মদ খান, তার পিতা খিলজীর খাজা, তার পিতা তোগলক তাইমুর খান, তার পিতা আইশ বুগা, তার পিতা দাওয়া খান, তার পিতা বুরাক খান, তার পিতা ইসান বুগা, তার পিতা মতুকান খান, তার পিতা চাগতাই খান, তার পিতা চেঙ্গিস খান।[৫]

তৈমুরদের আদিবাস ছিল মধ্য এশিয়ার মাওয়ারুন নহর নামক অঞ্চলে। বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা এ অঞ্চলের একজন তুর্কি গোত্রের প্রধান ছিলেন। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে হতে ১২২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র তিন বছরের মধ্যে তুর্কিস্থানের এ অঞ্চল দখল করে নেন। তখন থেকে মোঙ্গলরা তুর্কিস্থানের এ এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন। মোঙ্গলরা ক্রমশ তুর্কিদের আচার-আচরণ ও ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তুর্কিদের সঙ্গে মোঙ্গলদের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এভাবে মোঙ্গলদের সাথে তুর্কিদের সখ্যতা বেড়ে ওঠে। তাইমুরের ৫ম পুরুষ কারাচার খান এক মোঙ্গল রাজকুমারীকে বিয়ে করলে তুর্কি ও মোঙ্গলদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। ফলে তারা একই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তুর্কিস্থানের তাইমুর ও চেঙ্গিস খানের সংমিশ্রিত এ জাতিই ইতিহাসে মোগল নামে পরিচিত।

মোঙ্গলদের আদি বাসস্থান মোঙ্গলিয়া। চীনদেশের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে বর্তমান মোঙ্গলিয়া ছিল মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি। এ ভূখণ্ডটি গোবী মরুভূমির উত্তরে এবং বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে তাদের বসবাস ছিল। এরা তাতার নামে পরিচিত।[৬] তারা বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে সে অঞ্চলসমূহের ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে স্থানীয়দের সাথে একীভূত বসবাসের প্রয়াস চালায়। ফলে রাশিয়া অঞ্চলের বিজয়ীরা খৃষ্টান, চীন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম এবং মধ্য এশিয়ার বিজয়ীরা ইসলাম গ্রহণ করেন। মোঙ্গলিয়ায় বসবাসকালে গোত্রগুলো প্রায়ই দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হতো। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোত্রগুলোর মধ্যে সংঘাত শুরু হলে জেসুগাই (মৃঃ১১৯৬ খ্রিঃ) নামের এক ব্যক্তির আর্বিভাব হয়। তার মৃত্যুর পর তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র 'তেমুজীন'[৭] ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান নাম ধারণ করে সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করে মোঙ্গলিয়ায় একক আধিপত্য কায়েম করেন। চেঙ্গিস খান অর্থ মহান বা পৃথিবীর নেতা।[৮]

মোঙ্গল জাতি কোন ঐক্যবদ্ধ জাতি ছিল না। গৌবী মরুরভূমি এলাকায় এরা বিচিছন্নভাবে বসবাস করত। এদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর। মেষ চারণ, পশু শিকার ও লুটতরাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। দুধ ও মাংশ ছিল তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। তারা তাঁবুতে বসবাস করত এবং পশুর চামড়া দিয়ে লজ্জা নিবারণ করত। চেঙ্গিস খান সর্ব প্রথম মোঙ্গলজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন।[৯] ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান তাদের নেতা নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে উঠে।[১০] তার দুর্ধর্ষতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চেঙ্গিস খান তার

অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ও সাংগঠনিক শক্তিবলে একের পর এক দেশ জয় করতে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, যোগ্য প্রশাসক। তিনি শুধু বিভিন্ন অঞ্চলই জয় করেননি, বিজিত অঞ্চলের দক্ষ কারিগর, ডাক্তার, পন্ডিত, নাবিক ও সৈনিকসহ নানা পেশার মানুষদের নিয়ে শক্তিশালী এক বাহিনী তৈরী করে মোঙ্গল জাতিকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেন।[১১]

চেঙ্গিস খান সর্বপ্রথম চীনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ১২১১ খ্রিস্টাব্দ হতে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোরিয়া, উত্তর চীন এবং পিকিং অধিকার করেন তিনি। ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মধ্য এশিয়ার বুখারা, সমরকন্দ, বলখ, খোরাসান, হিরাট প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে নেন।[১২] ১২২৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে চেঙ্গিস খানের সেনাপতি 'সুবাতাই' ইউরোপ আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক লেনপুলের ভাষায়- তিনি ছিলেন 'এশিয়ার আলেকজান্ডার'।[১৩] তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। জাতিকে তিনি সংঘবদ্ধ, উন্নত ও সমৃদ্ধ করে এশিয়ার এক শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠে এক বিশাল সাম্রাজ্য। যাযাবর তাতারগণ এশিয়ার এমন শক্তির রূপ লাভ করেন যে তৎকালীন কোন রাজশক্তিই তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসেনি। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তার ছেলে চাগতাইকে সরদারী দিয়ে যান।[১৪] চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার পরিবারের মধ্যে সাম্রাজ্য নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ সময় মোঙ্গল সাম্রাজ্য ৫ ভাগে ভাগ হয়ে যায়। চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র চাগতাই খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের একটি অংশ মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমান তুর্কিস্থানে বসতি গড়ে তোলেন এবং ইসলামে দিক্ষীত হন। ইসলাম গ্রহণের পর চারিত্রিক ক্ষেত্রে তাদের আমুল পরিবর্তন হয়। তাইমুর ও মোঙ্গলদের সংমিশ্রিত বংশধরেরাই পরবর্তীকালে আফগানিস্তান হয়ে ভারতবর্ষ জয় করেন।[১৫] তারা ইসলামের অনুসারী এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল ইরানী। তাইমুর ও চেঙ্গিস খানের বংশধরেরাই ইতিহাসে মোগল নামে পরিচিত।

তৈমুর লং ছিলেন একজন তুর্কি আমীরের পুত্র। সমরকন্দের কেচ নামক স্থানে বারলাম গোত্রে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম তুরঘাই এবং মাতার নাম তাকিনাহ খাতুন। তৈমুর শব্দের অর্থ লৌহ। ফার্সী ভাষায় লং শব্দের অর্থ খোঁড়া। মোঙ্গলদের বশীভূত করার জন্য প্রথম জীবনে তৈমুর লং কে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং সমরকন্দের সিংহাসনে বসেন।[১৬] ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে বলখ জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি দেশ জয়ের শুভ সূচনা করেন।[১৭] বাবরের উত্তর পুরুষ তৈমুর লং অনেক আগেই ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি সৈন্য দলসহ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পাঞ্জাব আক্রমণ

করেন। তারপর দিল্লী প্রবেশ করে সমগ্র রাজধানী লুটপাট ও ত্রাস সৃষ্টি করে এবং প্রচুর ধনসম্পদসহ মধ্য এশিয়ায় ফিরে যান। এরপর তৈমুর লং ইরান, আফগানিস্তান, ইরাকসহ একের পর এক দেশ জয়ের মাধ্যমে বিশ্ব বিজয়ী নেতা হিসেবে আর্বিভূত হন।[১৮] তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে মুসলমান হলেও অত্যাচারী শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে মেষ চরাতে গিয়ে খোড়া হন বলে তাকে লং বা খোঁড়া বলা হতো।[১৯] তিনি অত্যাচারী শাসক হলেও মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান বা হালাকু খানের মতো বর্বর ও নৃশংস ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলমান। তুর্কি ও ফার্সী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সুফি দরবেশদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং পর ধর্মে সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেননি। ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি অনেক অবদান রেখে গেছেন। তার নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা বাদ দিলে তাকে একজন উদার সাহসী ও সৃষ্টিশীল মানুষ বলে গণ্য করা যায়।[২০] ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে মারা যান।

বাবরের সিংহাসন লাভ ও শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই

তৈমুর লং এর তৃতীয় পুত্র মীরন শাহের পৌত্র ছিলেন আবু সাঈদ। আবু সাঈদের অন্যতম পুত্র ওমর শেখ মির্জা। তিনি ছিলেন ফরগনার অধিপতি। ওমর শেখ মির্জা ছিলেন বাবরের পিতা। তিনি ছিলেন অভিযান প্রিয় ব্যাক্তি। ফরগনার মতো ছোট অঞ্চল নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই বড় ভাই আহমদ মির্জা ও শ্যালক মাহমুদ খান এবং আহমদ খানের সঙ্গে শাসন কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় আকস্মিক দূর্ঘটনায় তিনি মারা যান।[২১] এ সময় বাবরের বয়স মাত্র ১১ বছর ৪ মাস। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাবর সিংহাসনে বসেন। বাবর তুর্কি শব্দ যার অর্থ সিংহ। বাবরের শরীরে তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খান দুজন বীরের রক্ত প্রবাহিত ছিল বলে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী ও বীর যোদ্ধা।[২২] বাবর সত্যিই সিংহের মতো সাহসী ছিলেন বলে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল।

বাবরের দাদী আইসান দৌলত বেগম তার রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করেন। তার তত্ত্বাবধানেই বাবর জ্ঞানচর্চার সুযোগ পান এবং অল্পকালের মধ্যেই বাবর তুর্কি ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। এই জ্ঞানচর্চা বাবরের রাজনৈতিক দক্ষতা বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বাবর তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ জয়ের ইচ্ছা পোষণ করেন। কারণ তৎকালীন সময়ে অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে সমরকন্দ ছিল এক সমৃদ্ধ নগরী। বাবর বয়সে অল্প হলেও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহন করে বাবর প্রথম আত্মীয়-স্বজনদের বাঁধার সম্মুখীন হন। বিশেষ

করে উজবেক নেতা শায়বানী খান তার চরম বিরোধীতা করেন। বাবর দীর্ঘ ১২ বছর উজবেগদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তিনি অদম্য সাহস, মনোবল নিয়ে সকল সংকটের মোকাবেলা করেন।

১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে সমরকন্দের তাইমুরী শাসকদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দিলে বাবর বাইসানগারকে পরাজিত করে সমরকন্দ দখল করেন।[২৩] সমরকন্দের আমীর-ওমরাহগণ বাবরের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সমরকন্দের উপর তার আধিপত্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তিনি সংবাদ পান ফরগনা রাজ্যের অন্দিজানে তার ভাই জাহাঙ্গীর মির্জাকে সিংহাসনে বসানো হয়েছে। তাই তিনি সমরকন্দ থেকে ফরগনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সুযোগে শায়বানী খান সমরকন্দ দখল করে নেন। বাবর অন্দিজানের বিদ্রোহ দমনে যখন ব্যস্ত তখন সুলতান আলী মির্জা শায়বানী খানকে পরাজিত করে সমরকন্দ দখল করেন। বাবর ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে অন্দিজান এবং ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে সমরকন্দ পুনঃরুদ্ধার করেন।[২৪] কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে পরের বছর ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ শায়বানী খান আবার সমরকন্দ দখল করে নেন। বাবর এ সময় নিজ আত্নীয়-মির্জাদের ষড়যন্ত্রে পিতৃরাজ্য ফরগনা থেকেও বিতাড়িত হন। বাবর উভয় রাজ্য হারিয়ে ভবঘুরের ন্যায় আশ্রয়হীনভাবে সময় কাটাতে বাধ্য হন।[২৫] এ সময় বাবর তার দুই মামা মাহমুদ খান ও আহমদ খানের সহযোগীতায় বেশ কয়েকবার ফরগনা উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। চূড়ান্তভাবে ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে শায়বানী খানের নিকট আর্চিয়ানের যুদ্ধে বাবর পরাজিত হয়ে ফরগনা উদ্ধারের চিন্তা চিরতরে ত্যাগ করেন।

ফরগনা ও সমরকন্দ উদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে বাবর ভারতবর্ষ জয়ের স্বপ্ন দেখেন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুলের শাসক আরঘুনকে পরাজিত করে কাবুল দখল করেন। এরপর বাবর গজনী, কান্দাহার সহ পুরো আফগানিস্তানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬] কিন্তু তিনি সমরকন্দের স্মৃতি ভুলতে পারেননি। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর হিরাতে তার ভাইদের সাথে দেখা করেন এবং সমরকন্দ জয়ের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের সম্রাট শাহ ইসমাঈল সমরকন্দ আক্রমন করে শায়বানী খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন। বাবর পরের বছর শাহ ইসমাঈলের সহযোগীতায় সমরকন্দের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সিংহাসনে বসে বাবর বাদশা উপাধী গ্রহণ করেন, শাহ ইসমাঈলের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং শীয়া রীতি-নীতি চালু করেন। এতে সমরকন্দের আমীর ওমরাগণ ও সাধারণ সুন্নী মুসলমানগণ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিরোধীতা করেন। এ সুযোগে শায়বানী খানের পুত্র ও উজবেগ নেতারা একত্রিত হয়ে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে গাজদাওয়ানের যুদ্ধে বাবর চূড়ান্তভাবে উজবেগদের কাছে পরাজিত হন এবং সমরকন্দ হারিয়ে কাবুলে ফিরে আসেন।[২৭] নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাবর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার আলোকে তিনি ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেন।

বাবরের ভারত জয়ের প্রেক্ষাপট

সম্রাট বাবর সমরকন্দের উজবেগদের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখেন। ভারতের ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদের প্রাচুর্যও তাকে হাতছানি দেয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাবর উপলব্ধি করেন ভারত জয় করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে বাবর সর্বপ্রথম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ইউসুফজাই গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং বাজাউর দূর্গ জয় করেন। তিনি ১৫২১ থেকে ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভীরা, শিয়ালকোট, দেবুল ও লাহোর জয় করেন। এদিকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে মোকাবেলা করার জন্য বাবরের নিকট সাহায্য চান। রাজপুত নেতা রানা সংগ্রাম সিংহও ভারত জয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তিনিও বাবরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন। বিদ্রোহী আলম খানও তার সাথে ছিলেন। সবকিছুই বাবরের অনুকূলে থাকায় তার জন্য ভারত জয় করা সহজ হয়।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ ও ২০ এপ্রিল বাবর ইব্রাহিম লোদীর সাথে পানিপথ নামক প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পানি পথের অবস্থান ছিল দিল্লী হতে আশি কিলোমিটার দূরে বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের অংশ।[২৮] বাবর ওস্তাদ আলী ও মোস্তফার নেতৃত্বে গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলেন। পানি পথের প্রান্তরে বাবর ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদীর ১ লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলা করেন। এ যুদ্ধে বাবর বারুদ, কামান ও বন্দুক ব্যবহার করেন। বাবরের সাহসী ও কৌশলগত ভূমিকার কারণে ইব্রাহিম লোদী বাবরের নিকট পরাজিত হন। ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে আগ্রা ও দিল্লী দখল করেন।[২৯]

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা হতে সাইত্রিশ মাইল পশ্চিমে খানুয়া নামক প্রান্তরে বাবর ও রানা সংগ্রাম সিংহ মুখোমুখি অবস্থান নেন। আশি হাজার অশ্বারোহী, পাঁচশত হাতিসহ রানা সংগ্রাম সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। বাবর পানিপথের যুদ্ধের মত একই কৌশল প্রয়োগ করে রানার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেন।[৩০] ১৭ মার্চ সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলে বিকেলে রাজপুত বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এই যুদ্ধ ইতিহাসে খানুয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে বাবর জয়ী হন এবং গাজী উপাধী ধারণা করেন।

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইব্রাহীম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে প্রায় এক লক্ষ সৈন্যসহ চুনারের নিকট একটি যুদ্ধে বাবরের নিকট পরাজিত হন। কতিপয় আফগান নেতা বাবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও শেরখান ও মাহমুদ লোদী বাংলায় আশ্রয় নেন। বাবর তাদের পিছু নিয়ে আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হন তাদের দমন করার জন্য। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে পাটনার নিকটবর্তী গোগরা নদীর তীরে সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।[৩১] ইতিহাসে এই যুদ্ধ গোগরার যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত। এটি ছিল বাবরের শেষ যুদ্ধ। খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধ

জয়ের ফলে দিল্লীর সিংহাসন শংকামুক্ত হয়।[৩২] বাবর কাবুল থেকে ভারতবর্ষে তার স্বপ্নের সাম্রাজ্য গড়ার সুযোগ লাভ করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল রাজবংশ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩১ বছর যাবৎ ভারত শাসন করে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

মোগল হারেমঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

'হারেম' শব্দটি আরবি 'হারিম' থেকে বুৎপত্তি লাভ করেছে। 'হারিম' শব্দের তুর্কি রূপ 'হারেম' (Harem) অথবা হারিম।[৩৩] আরবি হা-র-মীম শব্দমূল হতে হারাম, ইহরাম, ও হুরমা এ সকল শব্দ গঠিত হয়। এ সকল অর্থ এর মূল অর্থের সহিত সম্পর্কিত। আরবি ভাষায় হারিম শব্দের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। লিসানুল আরা'ব গ্রন্থে হারিম শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'আল-হারীমুল্লাযী হুররিমা মাসসুহু ফালা যুদনা মিনহু' অর্থ্যাৎ "হারিম হচ্ছে এরূপ বস্তু বা ব্যক্তি, যাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।[৩৪] হজ্জব্রত পালনকারী মুহরিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রকে হারিম বলা হয়। বিয়েযোগ্য মেয়েদের সৌন্দর্যচচার ঘর, মুসলিম রমনীদের বাসগৃহ অথবা কোন নারীনিবাস যেখানে স্বামী-সন্তান বাপ-ভাই ছাড়া অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ এমন গৃহকেও হারীম নামে অভিহিত করা যায়।[৩৫] বাংলা ভাষায় হারেমের অর্থ করা যায়-অন্দর, অন্দরমহল, অন্তগৃহ, ভোগালয়, ভোগবাস, শুদ্ধান্ত; হারেম প্রভৃতি।[৩৬] এ ছাড়াও কোন কোন অভিধান প্রণেতা হারেমকে বেশ্যালয়ের প্রতিশব্দ হিসেবে দেখিয়েছেন যা সঠিক নয়।[৩৭] মূলত হারিম বলতে যে কোন পবিত্র ও সম্মানিত স্থান বুঝায়। মধ্যযুগে শাহী প্রাসাদের নারীনিবাসকেও হারিম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হারিম-এর আরো অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন-হারিম রাজপ্রাসাদের চারপাশ এরূপ স্থান বা সীমারেখাকে বলা হয়, যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। স্ত্রীকেও হারিম বলা হয়; কারণ স্বামী তাকে রক্ষা ও হিফাজত করে থাকে। কাবা শরীফের চারপাশ প্রাচীরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত পবিত্র স্থানকেও 'হারিম' বলা হয়। উর্দু ভাষায় হারিম শব্দের অর্থ করা হয়েছে কোন গৃহের এরূপ অংশ যেখানে প্রবেশ করা পর পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ। বিশেষভাবে মহিলাদের বাসস্থানরূপে নির্ধারিত গৃহাংশকে হারিম বলা হয়।[৩৮] ফার্সী ভাষায় হারিম শব্দের ব্যাপক অর্থ রয়েছে যেমন-যে কোন গৃহ, গৃহ প্রাচীর ও বেষ্টনী। মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে কৃষিকার্য অথবা গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমিকেও ফার্সী ভাষায় হারিম বলা হয়। ফার্সী ভাষায় বিভিন্ন শব্দ সংযোগে হারিম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-হারিম-ই চামান (উদ্যান বেষ্টনী) হারিম-ই কাফাস (খাঁচার বেড়া); হারিম-ই খারাবাত (পানশালার বেষ্টনী), হারিম-ই নাম (প্রেয়সীর অন্তকরণ); হারিম-দিল (অন্তকরণের বেষ্টনী); হারিম ই-সীন (বক্ষ বেষ্টনী)।

এ ছাড়া কাবা শরীফের চতুস্পার্শ্বস্থ পবিত্র ও সম্মানিত স্থানকে ও ফার্সী ভাষায় হারিম বলা হয়। হারাম শরীফে অবস্থানরত মহিলাকেও হারিম বলা হয়।[৩৯]

সুতরাং হারেম, হেরেম ও হারিম শব্দটি আমরা যেভাবেই বলিনা কেন এর শব্দগত অর্থ একই। আরবি, উর্দু ও ফার্সী ভাষাতেও শব্দটির অর্থ প্রায় কাছাকাছি। তবে শব্দটি মূলত আরবি হারিম শব্দেরই তুর্কি ও ইউরোপীয় রূপ। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় গৃহ, অন্তপুর, জানানা মহল, অন্দরমহল নানা অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়। শব্দটির সবগুলো অর্থই পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও সম্মানিত অর্থের সাথেই সংশ্লিষ্ট। অশ্লীলতা, বিকৃত যৌনচার, নারীভোগের সাথে হারেমের কোন সম্পর্ক নেই। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা হারেম বলতে মোগল অন্তপুর, অন্দরমহল, নারীনিবাস বা জানানা মহলকেই বুঝাব।

হারেম প্রথার উৎপত্তি

হারেম প্রথার সূচনা হয় উমাইয়া আমল থেকে। খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালীদের আগে হারেম প্রথার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়না।[৪০] তবে হারেম সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় তার জনক বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা ও দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ। আরব বিশ্বের উমাইয়া খেলাফতের অবসানের পর হারেম প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলিম শাসকেরা পারস্য ও গ্রীকদের থেকে হারেম সংস্কৃতির ধারণা লাভ করে। হারেমের মহিলাদের পাহারার জন্য নপুংষ ক্রীতদাস নিযুক্ত করা হয়। এদেরকে খোঁজা প্রহরী বলা হতো। খোঁজাদের রাজহেকিম দ্বারা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে তাদেরকে হারেমের পাহারায় নিযুক্ত করা হতো।[৪১] মধ্যযুগে অনেক দেশেই খোঁজা প্রহরী এবং ক্রীতদাস কেনা বেচা হত। প্রথম দিকে যে সব নপুংষ ক্রীতদাস নিয়োগ করা হত তারা ছিল মূলত গ্রীক। তাই বলা যায় গ্রীক সভ্যতা থেকে মুসলিম শাসকেরা হারেম প্রথা গ্রহণ করেন।

পর্দা ইসলামে একটি ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের উপর পর্দা ফরজ। পর্দা বাংলা শব্দ আরবিতে হিজাব যার অর্থ আড়াল করা, ঢেকে দেওয়া, আবরণ, অন্তরাল প্রভৃতি। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ শব্দটির অর্থ দাড়ায় পরপুরুষ হতে নিজেকে আড়াল করে আলাদা করে রাখা। জনসাধারণের দৃষ্টি হতে অগোচরে মহিলাদের অন্তপুরে বসবাসই হারেম। শব্দগতভাবে পর্দা ও হারেমের অর্থ আলাদা হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায় একই অর্থ বহন করে। ইসলামে বয়োসন্ধিকাল থেকেই মুসলিম নারীদের পর্দার বিধান মেনে চলতে হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই নারীদের জন্য অন্তপুরে বসবাসকেই প্রাধান্য দেয়া হতো। পবিত্র কোরআনে মহিলাদের পর্দা প্রথা মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪২] কোরআনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে পারস্য দেশের নারীরা কঠোর ভাবে পর্দা প্রথা মেনে চলতেন। আরব বিশ্বে উমাইয়া খেলাফতের অবসানের পর আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে পারস্য প্রভাব ব্যাপকভাবে

লক্ষ্য করা যায়। আব্বাসীয় খলিফা হারুন আর রশীদের সময় রাজকীয় পরিসরে পর্দা প্রথা কঠোর ভাবে চালু হয়।[৪৩] আব্বাসীয় শাসনামলে বেশ কয়েকজন খলিফার সময় হারেমের মহীয়সীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবাঈদা ও খলিফা মুকতাদিরের মা পর্দার আড়াল থেকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন।

প্রাচীন পারস্য ও গ্রীসে অনেক আগে থেকেই পর্দা প্রথা চালু ছিল। তখন মেয়েরা আলাদা করে অন্তপুরে বসবাস করতেন।[৪৪] আরব ও তুর্কিরা তাদের থেকে এই প্রথা অনুসরণ করে মেয়েদের পৃথক করে রাখেন। ভারতেও মেয়েদের আলাদা করে রাখার রীতি আগে থেকেই চালু ছিল।[৪৫] ভারতে হিন্দু নারীরা মনে করতেন বিদেশীরা তাদের ধরে নিয়ে যাবে এই ভয়ে তারা পর্দা প্রথা মেনে চলতেন। মূলত পর্দা প্রথার পেছনে সামাজিক ও ধর্মীয় কারণই প্রধান বলে মনে হয়। তবে বর্তমান পর্দা প্রথার সূচনা হয় মুসলিম শাসনামল থেকে।[৪৬] পর্দা প্রথার মাধ্যমে মেয়েদের আলাদা করে রাখার ধারণা থেকেই হারেম প্রথার উদ্ভব হয়েছে।

মোগল হারেমের গঠন ও প্রকৃতি

মোগল হারেম বিস্তৃত এক পরিমন্ডলকে নিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। হারেম ছিল মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। মোগল সম্রাটদের মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন, পুত্রবধু, তাদের দাসী-বাদী, উপপত্নী, খোঁজা প্রহরী নিয়ে মোগল হারেম গঠিত।[৪৭] মধ্যযুগে ভারতীয় শাহী পরিবারের মহিলাদের এ আবাসস্থলগুলিকে মহল[৪৮] ও শাবিস্তান-ই-ইকবাল' অথবা 'শাবিস্তান-ই-খাস' হিসেবেও পরিচিত ছিল।[৪৯]

হারেমে সকল শ্রেণীর মহিলা আত্মীয়ের স্থান ছিল। ক্রীতদাসী, খোঁজা প্রহরী মহিলাদের আবাসস্থলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পরিচারিকারাও হারেমের বাসিন্দা ছিল। মোগল রাজপ্রাসাদের যে বিশাল অংশ জুড়ে মহিলারা বসবাস করতেন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা ছিল। এ ছাড়াও উপপত্নীদের[৫০] জন্য তিনটি পৃথক মহল ছিল। এগুলোর নাম ছিল লেখেবার (রবিবার) মঙ্গল (মঙ্গলবার) এবং জেনিসার (শনিবার মহল)। সম্রাট উল্লেখিত দিনে এ সকল মহলে গমন করতেন। এছাড়া বিদেশী উপপত্নীদের জন্য 'বাঙ্গালী মহল' নামে আরোও একটি পৃথক মহল ছিল।[৫১]

মোগল হারেমে বেগমদের জন্য যে পৃথক মহল ছিল তাতে ছিল জলসা ঘর, গোছলখানা, আরামগৃহ, একাধিক গুলবাগিচা সম্বলিত তাবু। মহলের ভিতরে সুন্দর রাস্তা, ছায়াঘেরা কুঞ্জবন, ঝর্ণা, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, উচু মঞ্চ ও সুউচ্চ তোরণ ছিল। হারেমের খাস মহলের কক্ষগুলো স্বর্ণমন্ডিত এবং নানা চিত্রে সুশোভিত ছিল। দেয়ালের সাথে বড় বড় আয়না শোভা পেত। হারেমের ভিতরের আসবাবপত্র ও অলংকরণ ছিল অপূর্ব, মেঝেতে নরম পুরু নকশা তোলা রঙ্গীন গালিচার উপর মখমলের মসনদ থাকতো।

ঝিনুক আর হাতির দাত দিয়ে কাজ করা চন্দন কাঠের চৌকিতে নানা উন্নতমানের খাদ্য সামগ্রী সাজানো থাকতো। ছোট উন্নতমানের মর্মর পাথরের বাটিতে পেস্তা, কিসমিশ, মুনাককা, কাজু প্রভৃতি রাখা থাকতো। সোনার পানদানিতে পান ও মসলা; লম্বা নলযুক্ত রুপার রঙ্গীন স্বচ্ছ কাচের হুককা পাশে থাকতো ।[৫২]

মোগল সম্রাটদের স্ত্রীদের বেগম বলা হতো। সম্রাটগণ সাম্রাজ্যের একক ক্ষমতার অধিকারী হলেও হারেম পরিচালনার দায়িত্বভার দেয়া হতো সবচেয়ে প্রতিভাময়ী ও ক্ষমতাশালী মহিলার উপর। সম্রাটদের একাধিক স্ত্রী থাকত। এদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই সাধারণত প্রধান স্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হতেন। তাকে বলা হতো বাদশা বেগম।[৫৩] তার নির্দেশের বাইরে কোন কিছুই করা যেত না। হারেমে হিন্দু রমনীরা তাদের আভিজাত্য আর ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করতো। মহলের ভিতর তাদের কড়া পর্দা রক্ষা করে চলতে হতো।[৫৪] নিজস্ব মহলে তারা পূর্জা অর্চনাও করতো। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

ইউরোপীয় পর্যটকরা মোগল হারেমকে আনন্দ-বিনোদনের লীলাভূমি বা রংমহল বলে ধারণা করতেন। তারা মনে করতেন হারেম হলো নারীশালা বা নারী নিকেতন। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তারা কাল্পনিক ঘটনা ব্যবহার করে মোগল বেগম ও শাহজাদীদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন। তাদের তথ্যসমূহ যাচাই না করে নির্দ্বিধায় ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় ইতিহাসবিদগণ তাদের লেখা বিবরণসমূহের সত্যতা যাচাই করতে থাকেন। ফলে অনেক ঘটনাই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়।[৫৫]

মোগল হারেম ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মোগল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বেগম ও শাহজাদীদের কাব্য ও শিল্প চর্চায় গড়ে উঠে হারেম সংস্কৃতি। তাদের শান-শওকত, আভিজাত্য, বিলাস-ব্যাসনের পিঠস্থান ছিল এ হারেম। ক্ষমতাকেন্দ্রিক প্রাসাদ রাজনীতি নিয়ন্ত্রন হতো এখান থেকেই। মূলত দূর্ভেদ্য প্রাচীর, খোঁজা ও রাজপুত প্রহরী, নারী গুপ্তচর এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের পাহারায় হারেম ছিল নিরাপদ, সুদৃঢ় ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। ইউরোপীয় পর্যটকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ প্রসূত অথবা এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বুঝতে না পেরে হারেম সম্পর্কে মনগড়া কল্পকাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

আবুল ফজলের মতে, আকবরের সময়ে হারেমে মহিলাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের অধিক।[৫৭] তিনি হারেমের অধিবাসীদের যে সংখ্যা উপস্থাপন করেছেন তাতে সকল শ্রেণীর রানী মাতা, খালাগণ, পালক মাতা, সম্রাটের ভগ্নিগণ, কন্যাগণ, সম্রাটের প্রধান স্ত্রী, অপ্রধান স্ত্রীগণ, উপপত্নীগণ, কৃতদাসী, নর্তকী , হারেমের মহিলা কর্মকর্তা-

কর্মচারীগণ, আমীরগণের স্ত্রীগণ ও তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্বপালনরত মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উৎসব উপলক্ষ্যে যে সব মহিলা অতিথি বা আত্মীয়স্বজন অন্দর মহলে অবস্থান করতেন, যারা রাজকীয় অন্দর মহলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন তাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করছেন। প্রকৃতপক্ষে হারেমে সকল শ্রেণীর মহিলাদের জন্য একেবারেই পৃথক পৃথক কোন মহল ছিলনা। মহিলা কর্মচারীবৃন্দ যেমন মুসরিফ, টহলদার, যারা সেবা ও পরিদর্শনের জন্য নিয়োগ লাভ করেছিলেন তারা প্রতি দিনের কাজ শেষে নিজ বাড়িতে ফিরে যেতেন। আমীরদের স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজনরাও নির্ধারিত কাজ শেষে নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতেন। তবে খোশরোজ, নওরোজ, বিবাহ উৎসব এবং অন্যান্য কারণে আমীরদের স্ত্রীগণ মহলে কিছু দিনের জন্য থাকতেন। অনুষ্ঠান শেষে তারা স্ব স্ব বাসস্থানে চলে যেতেন। বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আগত নর্তকীর দল হারেমের অনুষ্ঠান শেষে তাদের বাসস্থলে চলে যেতেন। গৃহভৃত্যসহ অন্যান্য সকলের জন্যও একই নিয়ম চালু ছিল।[৫৮] হারেমের সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন সময়েই তারা এক সঙ্গে মহলে থাকতেন না। এদের অধিকাংশই ছিলেন হারেম বহির্ভূত সদস্য। মূলত হারেমের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

সম্রাট বাবর ও হুমায়নের শাসনামলে মোগল হারেমের আকার ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট। সম্রাট আকবরের সময় বসবাসের জন্য সুরক্ষিত প্রাচীর দ্বারা বিশাল দূর্গ নির্মাণ করা হয়। যার মধ্যে মহিলাদের বসবাসের জন্য পৃথক পৃথক মহল তৈরী করা হয়েছিল। আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লী, আজমীর ও লাহোর দূর্গে এসব মহলগুলো নির্মিত হয়েছিল। এসব দূর্গে রাজপ্রাসাদ, দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, কাছারী, অন্যান্য সরকারী অফিস, আমীরদের তাবু এবং প্রহরীদের পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনা ছিল। রাজপ্রাসাদের সংশ্লিষ্ট অংশ নিয়েই হারেম নির্মিত হয়েছিল। হারেম একটি শক্তিশালী প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। রাজপ্রাসাদের এক পাশে রাজকীয় মহিলাদের বাসস্থান ছিল তাকে মহল নামে আখ্যা দেয়া হতো। আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লির রেডফোর্ড, লাহোর ও আজমীরের দূর্গে এই মহলগুলো সে স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। আজমীরের দূর্গটি ছিল বেশ ছোট। সম্রাট আকবরের সময়ে উহা মেরামত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। আগ্রা দূর্গের অভ্যন্তরে সম্রাট আকবর পাঁচশত অট্টালিকা লাল পাথর দ্বারা 'আইন রাজ্য' নির্মাণ করেছিলেন।[৫৯] শাহজাহান শ্বেত পাথরের অট্টালিকা নির্মাণের জন্য পরবর্তীতে এই সবগুলো স্থাপনা ধ্বংস করেছিলেন। এখনও যা অবশিষ্ট আছে তাতে প্রাথমিক পর্যায়ে মোগল রাজপ্রাসাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন প্রাসাদ হল আকবরী মহল।

পরবর্তীতে সংযুক্ত হয়েছিল জাহাঙ্গীরী মহল। এলাহাবাদ দূর্গের রাজপ্রাসাদে একটি আকর্ষনীয় বারেন্দা এখনও বিদ্যমান আছে।

সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রিতে বৃহত্তম ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় জোধবাই প্রাসাদ তৈরী করেন। দুইতালা বিশিষ্ট এ প্রাসাদ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহল। এই মহলের কক্ষগুলো ছোট ও অত্যন্ত সু-সজ্জিত ছিল। এটি 'মরিয়ম' মহল নামেও পরিচিত।[৬০] আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রির মহল গুলো ছিল প্রায় একই ধরনের। বড় মহলগুলোতে দুইশত এবং ছোট মহলগুলোতে ১৬ জন লোক বাস করতে পারত। প্রত্যেক মহলে জলাশয় এবং ইট বাঁধানো উঠোন ছিল। শাহজাহান আগ্রা ও লাহোর দূর্গে নির্মিত বেলেপাথরের বহু স্থাপনা ধ্বংস করে তদস্থলে মহিলাদের বসবাসের জন্য মার্বেল পাথরের রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। আগ্রাতে তিনি খাশমহল, শিশমহল, মোছাম্মান বুরুজ, আঙ্গুরীবাগ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। লাহোর দূর্গে মহিলাদের নামাজের জন্য আলাদা মসজিদও ছিল।

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান নতুন রাজধানী হিসেবে শাহজাহানাবাদ নির্মাণ করেন। রাজকীয় মহিলাদের জন্য সেখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মহল নির্মাণ করেন এবং প্রত্যেক মহল আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করেন। যেমন মতিমহল, হিরামহল, রংমহল এইভাবে বিভিন্ন নামে রাজপ্রাসাদের মহল তৈরী করেছিলেন। মহলগুলো এক সারিতে দূর্গের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত ছিল। এ সব স্থাপনাগুলো এখনও আগ্রা, লাহোর বা ফতেপুর সিক্রিতে দেখা যায়; যা অত্যন্ত সুন্দর দেখাত। মহিলাদের পদমর্যাদা ও আয় অনুসারে রাজপ্রাসাদে মহলগুলো ব্যবহৃত হত।

আমীরগণের স্ত্রীরা নওরোজ, খোশরোজ বা ঈদ উপলক্ষ্যে রাজপ্রাসাদে এসে তাবুতে ঘুমাতেন। তাদের জন্য পৃথক ঘর বা গোছলখানা ছিলনা। তাদের সঙ্গী সাথীরা এক সঙ্গে বড় তাবুতে বারান্দায় ঘুমাতো। দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস রাজকীয় পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত ছিল। দেওয়ানী আমকে সর্ব সাধারণের রাজগৃহ বলা হতো। কারণ সম্রাট এখানেই সকল প্রজাসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ দান করতেন। দেওয়ানী খাসে সম্রাট আমীরদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ সভা করতেন। এছাড়াও দেওয়ানী খাস রাজকীয় মহিলাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হত। দেওয়ানী খাসকে স্বর্গ বলা হত। দেওয়ানী খাসের সামনে সোনার হরফে লেখা ছিল-

'আগার ফেরদৌস বররুয়ে জামিনাস্ত,
হামিনাস্ত ও হামিনাস্ত ও হামিনাস্ত'।[৬১]

(এ ধরার বুকে যদি থাকে বেহেশতের বাগান/ এই সেই স্থান এই সেই স্থান এই সেই স্থান)।

হারেমের লোকজন গ্রীষ্মকালে খোলা জায়গায় ঘুমাতে আনন্দবোধ করত। হারেমের বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ কক্ষগুলি সম্রাট, বেগম ও শাহজাদীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত বাতাস ও শীতকালে সূর্যের আলো সম্বলিত জলবায়ুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে মহলগুলো তৈরী করা হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর মহিলারা বারেন্দা, বড় ঘর ও তাবুতে বসবাস করত। সেবা শ্রেণীর লোকেরা ঘরের ছাদযুক্ত মাটি ও বাঁশের ঘরে বাস করত। মোটকথা হারেমে রাজকীয় মহিলারা বিলাসবহুল মহলে জাঁকজমকপূর্ণভাবে বসবাস করতেন। তাদের জন্য সেবাদানকারী মহিলারও হারেমে আলাদা ব্যবস্থাপনায় বসবাস করতেন। বাসস্থান হিসেবে মোগল হারেম ছিল উপযুক্ত স্থান।

মোগল সম্রাটগণ যখন ভ্রমণে যেতেন তখন হারেমের সব মহিলারা তার সঙ্গী হতেন না। বিশেষ কিছু নারী তার সফর সঙ্গী হতেন। সম্রাট যে পথে যেতেন সেই পথের দূর্গে এবং রাজপ্রাসাদে তারা অবস্থান করতেন। সম্রাটগণ তাদের থাকার জন্য কিছু ছোট রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। আগ্রা, লাহের ও কাশ্মীরের উদ্যানে এই প্রাসাদগুলো দেখা যায়।

প্রথা অনুযায়ী শাহজাদাগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত হারেমে বসবাস করতে পারতেন। এর পর তাদের হারেম ত্যাগ করতে হতো। যখন শাহজাদা খররমের বয়স ১৬ তখন তাকে হারেমের বাহিরে পৃথক মহল প্রদান করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর খররমকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাই তাকে বাহির মহলে না রেখে প্রধান উজীর মুহাম্মদ মুকীম খানের বাসায় রাখেন। মুকীম খানের বাসা দূর্গের মধ্যে সম্রাটের মহলের কাছাকাছি ছিল। শাহজাদা খররমের বসবাসের জন্য তিনি ঐ মহল ছেড়ে দেন। অনুরূপভাবে খসরুকেও মুনিম খানের মহলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এই মহলটি রাজপ্রাসের বাহিরে ছিল।[৬২] তার মহলটি সংস্কারের জন্য তৎকালীন মূল্যে এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে শাহজাদা পারভেজকে মহব্বত খানের মহলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমীরগণের হারেমও মহল হিসেবে পরিচিতি ছিল। তাদের মহলগুলো ইট, চুন ও কাঠের সাহায্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। কিছু মহল শুধু মাটির প্রাচীরের উপর ছাদ দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল; যা পরবর্তীতে ধ্বংস হয়ে গেছে। সে সব ধ্বংসাবশেষের চিত্র এখনও বিদ্যমান আছে। আমীরগণের মহলের কারণে আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি, দিল্লী ও লাহোর দুর্গের সীমানা অনেক বড় ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় আগ্রা শহর সাত মাইল প্রশস্ত ছিল। অভিজাত অমত্যগণের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ছিল। আসফ খানের প্রাসাদ ছিল খুবই সুন্দর।[৬৩] আমত্যগণের প্রাসাদের আয়তন প্রায় একই ছিল। এ সব প্রাসাদের এক অংশ দিওয়ান খানা অন্য অংশ জিনান খানা নামে পরিচিত ছিল।[৬৪] আমত্যগণের প্রাসাদে মহলগুলোর সাথে পুকুর, ঝর্ণা ও সুন্দর সুন্দর বাগান ছিল। সব মিলিয়ে অভিজাত আমীরদের মহলগুলোও উন্নত আবাসন বলে গণ্য হতো।

ভ্রমণরত অবস্থায় তাবুতে হারেম

হারেমের মহীয়সীগণ সম্রাটদের সাথে ভ্রমণ করতেন। ভ্রমণরত অবস্থায় হারেমের মহীয়সী নারীরা মোটা কাপড়ের নিচে তাবুতে বসবাস করতেন। প্রাদেশিক সরকারের কার্য দেখা, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা, যুদ্ধবিগ্রহ এবং শিকারের জন্য মোগল সম্রাটগণ বেশী সময় তাবুতে কাটাতেন। এ সময় হারেমের অনেক নারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ভৃত্য, নিরাপত্তা প্রহরীসহ বিরাট বহর তার সঙ্গে থাকতো। তারা রাজধানীর বাহিরে কোলাহলমুক্ত পরিবেশে বসবাস করতেন। কাশ্মীরের মত ঠান্ডা ও মনোরম আবাসস্থলে যেতেন।[৬৫] সকল মোগল সম্রাটগণ অনেক দীর্ঘ সময় ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার স্ত্রীদের নিয়ে ২/৩ মাসের জন্য শিকারে বের হতেন এবং তাবুতে বাস করতেন। বত্রিশ বছরের রাজত্বের প্রায় অর্ধেক সময় শাহজাহান রাজধানীর বাহিরে তাবুতে কাটিয়েছেন।[৬৬]

ভ্রমণরত অবস্থায় হারেমের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা সমানভাবে চালু ছিল। ভ্রমণরত অবস্থায় যে তাবু টাঙ্গানো হতো তাতে ২টি অংশ ছিল। একটি অংশ দরবার ও অফিস অন্য অংশ অন্দরমহল বা হারেম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৬৭] মীর মঞ্জিল ভ্রমণের সকল উপকরণ নিয়ে আগে যেত এবং তাবু স্থাপন করে সম্রাটের আগমণের জন্য অপেক্ষা করতেন। সম্রাট হুমায়নের সময় এমন এক তাবু ব্যবহার করা হয় যার ভিতর প্রচুর আলো-বাতাস পাওয়া যেত এবং রাতের বেলায় আকাশের তারা দেখা যেত। পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবর আরো বড় পরিসরে চারতলা বিশিষ্ট উচু তাবু ব্যবহার করতেন। সেটা ব্যবহার করতে কাঠ ব্যবহার করা হতো। সম্রাট আকবরের সময় ভ্রমণে তাবু স্থাপন ও অন্যান্য কাজের জন্য একশত হাতি, পাঁচশত উট, চারশত গাড়ী ও একশতজন কর্মচারী সঙ্গে নেয়া হতো।[৬৮] এছাড়াও পাঁচশত নিরাপত্তা প্রহরী, একশতজন পানি বাহক, পঞ্চাশজন তাবু প্রস্তুতকারক মিস্ত্রী, আলো বহনকারী, ত্রিশজন চামড়া শ্রমিক, দেড়শত জন ঝাড়ুদার এবং পাঁচশত জনের একটি অগ্রগামীদল সঙ্গে থাকতো।

ভ্রমণরত অবস্থায় হারেমের গুরুত্বপূর্ণ মহিলারা হাতীর পিঠে আরোহন করতেন। অন্যরা গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনে ভ্রমণ করতেন। সম্রাট আকবরের সময় হাতি দিয়ে টানা গাড়ি ব্যবহার করা হতো। এ গাড়িগুলোকে 'বাহাল' বলা হতো।[৬৯] সম্রাটগণের বেগম ও শাহজাদীগণ গাড়িতে এমনভাবে থাকতেন যে তাদেরকে দেখা যেতনা কিন্তু তারা পথিককে দেখতে পেতেন। সম্রাটের পুত্রদের মধ্যে হতে একজন পুত্র তাদের সহযাত্রী হতেন; যাতে ভ্রমণে কোন অনাকাংখিত লোক ঝামেলা করতে না পারে। বেগম ও শাহজাদীদের দেখার জন্য রাস্তায় বহুলোক ভীড় করতো। কম দূরত্বের ভ্রমণে পালকী, হাতি ও হালকা গাড়ি ব্যবহার করা হতো। মহিলাদের সাথে ভ্রমণের সচরাচর গতি ছিল প্রতিদিন দশ মাইল। সামরিক অভিযানে সৈন্যদের সাথে ভ্রমণের গতি ছিল বিশ হতে

চব্বিশ মাইল।[৭০] আগ্রা হতে কাশ্মীর ভ্রমনে সাড়ে তিন মাস সময় লাগত। লাহোর হতে আগ্রা ভ্রমণে বিরতিসহ সত্তর দিন সময় লাগত। ফিরতেও অনুরূপ সময় ব্যয় হতো।

হারেমের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা

মোগল সম্রাটগণ হারেমের মহিলাদের ভরণপোষণ ও নিয়ন্ত্রনের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রশাসন কাঠামো ও শৃঙ্খলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছিলেন। হারেমের ব্যবস্থাপনা ও শাসনকাঠামো ছিল পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিভাগের মত। আকবরের সময়ে এ ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা হয়েছিল। হারেমে প্রচুর সংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরী থাকা সত্ত্বেও সম্রাটগণ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এই ব্যবস্থাপনা পরবর্তী সকল মোগল সম্রাটগণও অনুসরণ করেছিলেন।[৭১] তারা হারেমের তত্ত্বাবধান, তদারক ও নিরাপত্তার জন্য বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

হারেমে দু'ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে শুধুমাত্র মহিলা কর্মকর্তা কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। বহি নিরাপত্তা ছিল খোজা প্রহরীদের হাতে। মহলের ভিতর যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী দায়িত্ব পালন করতেন তারা হলেন, দারোগা, মহলদার, মুসরিফ, টহলদার এবং বিজ্রি। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পদমর্যাদা হিসেবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।[৭২] উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বা প্রথম শ্রেণী। মধ্যম পদস্থ কর্মকর্তা বা দ্বিতীয় শ্রেণী ও নিম্ন-শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী।

দারোগা

হারেমের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল যে মহিলা কর্মকর্তার উপর তাকে বলা হতো দারোগা। তাকে মেট্রন ও বলা হতো। তারা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা। সম্রাট কর্তৃক তাদের নিয়োগ দেয়া হতো। হারেমের সামগ্রীক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা তারা দেখভাল করতেন। এটা ছিল সম্মানজনক একটি পদ। অধিকাংশ দারোগা বা মেট্রন সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমতি ও উচ্চ বংশীয় ছিলেন। তারা ছিলেন সমাজ সচেতন ও দায়িত্ববান নারী। হারেমে অবস্থানরত মহিলারা যেন তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন তা নিশ্চিত করা ছিল তার কাজ।[৭৩] হারেমের আভ্যন্তরীন শৃংখলা, আদেশ-নিষেধ, নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলো দারোগাগণ তদারক করতেন। নূরজাহানের মাতা আসমত বানু বেগম ছিলেন দারোগাদের একজন।[৭৪] সম্রাট আকবর স্বীয় যোগ্যতা, মেধা ও যোগ্যতা বলে অনেক নারীকে নিম্নপদ থেকে হারেমের দারোগা পদে উন্নীত করেছিলেন।[৭৫]

মহলদার

হারেমের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো মহলদার। মহলদার দারোগাদের মধ্য হতে নিযুক্ত হতেন।[৭৬] তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের উপর সৃষ্টি রাখতেন। তিনিও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা। হারেমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কার্যকলাপ সম্প.র্ক তিনি সম্রাটকে অবগত করতেন। এমনকি তিনি সম্রাটের গুপ্তচর হিসেবেও কাজ করতেন।[৭৭] তিনি সম্রাটের বেগম ও শাহজাদীদের দেখাশুনা বিশেষ করে শাহংগাহাদীদের মধ্যে শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে মহলের প্রধান পরিদর্শক ও গোয়েন্দা। মহলদারদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শাহজাদা ও শাহজাদীদের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিচার করা হতো। তারা প্রতিদিনের ওয়াকিয়া সংবাদ বা সাধারণ সংবাদ এবং কুফিয়ান সংবাদ বা গোপন সংবাদ সম্রাটকে পড়ে শুনাতেন।[৭৮] সম্রাট সংবাদের ব্যাপারে কোন কিছু জানতে চাইলে তার জবাব তারা দিতেন। সংবাদের ভিত্তিতে সম্রাট কোন নির্দেশ দিলে তাও তারা কার্যকর করতেন। তারা ছিলেন সম্রাটের খুবই আস্থাভাজন ও প্রভাবশালী। মোগল হারেমে মহলদার হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, সাথী খানম, নূরুন নিসা, দিল আরাম বানু, হাজী কোকো, সাথীউন নেছা ও হামিদা বানু প্রমুখ।[৭৯] এদের মধ্যে সাথী খানম ও নূরুন নিসা আকবরের হারেমের মহলদার ছিলেন। দিল আরাম বানু ও হাজী কোকো জাহাঙ্গীরের হারেমের মহলদার, সাথীউন নেছা শাহজাহানের হারেমের মহলদার আর হামিদা বানু আওরঙ্গজেবের হারেমের মহলদার ছিলেন।[৮০]

মুসরিফ

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে সব কর্মকর্তা তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শক হিসেবে হারেমে কাজ করতেন তাদের বলা হতো মুসরিফ বা মেট্রন; মুসরিফগণ সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতেন। যারা মুসরিফ বা তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হতেন তারা যত্নের সাথে নির্বাচিত হতেন। সম্রাট আমীরগণের পুত্র ও কন্যাদেরকেও প্রথা অনুযায়ী এ পদে নিয়োগ করতেন। অনেক শিক্ষিত মহিলাকে মুসরিফ পদে নিয়োগ দেয়া হতো।[৮১] মুসরিফদের প্রধান দায়িত্ব ছিল উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হারেমের সকল ঘটনা দাখিল করা। মুসরিফ বা মেট্রনদের একটি অংশ হারেমে মহিলাভৃত্য, নর্তকী ও সেবাদানকারী কর্মচারীদের পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক মেট্রন দশজন করে গ্রুপভিত্তিক মহিলা কর্মচারীর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতেন। এসব মুসরিফ বা মেট্রনদের নাম ছিল যেমন- নিয়াজ বিবি বানু, কাদের বিবি বানু, গুলসুলতান বানু, সিমতান বানু, মেহের নিগার বানু, হিরাবাঈ বানু, নাভাল বাঈ বানু, মানিক বানু ইত্যাদি।[৮২]

টহলদার

টহলদার হলেন মহিলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও কোষাধ্যক্ষ। তারা ছিলেন মধ্যম শ্রেণীর কর্মকর্তা। তাদের দায়িত্ব ছিল হিসাব পরিচালনা ও হারেমের ব্যয়ের উপর নজর রাখা। হারেমের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বেতনভাতা তিনি বন্টন করতেন। [৮৩] বেতনভাতার জন্য সকলকেই এমনকি দারোগাকেও তার কাছে আবেদন করতে হতো। হারেমে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হতো টহলদারের নিকট তার আবেদন করলে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ টাকা প্রদান করতেন।[৮৪] তারা বাৎসরিক ব্যয়ের একটি হিসাবও তৈরী করতেন।

বিজি প্রহরী

বিজি প্রহরী মহলের ভিতর পাহারা দিতেন। তারা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর নিম্ন পদমর্যদাভুক্ত কর্মচারী। কুমারী ও কৃতদাসী শ্রেণীর নারীদের এই পদে নিয়োগ করা হতো।[৮৫] মহলের দরজায় অস্ত্রসহ, হাবসী, তাঁতার, তুর্কী, কাশ্মিরী মহিলা প্রহরীরা পর্যায়ক্রমে পাহারায় নিযুক্ত থাকতেন। সম্রাটের শয়নকক্ষের চারিপার্শ্বেও কঠোর নিরাপত্তা বিধান করা হতো। সম্রাট বাবর ও হুমায়নের সময় থেকেই অস্ত্রসজ্জিত মহিলা প্রহরী পাহারা দিত। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর এই ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেন। বিজি প্রহরীগণ তীর ধনুক ও তরবারী চালনায় পারদর্শী ছিলেন।[৮৬] অস্ত্রসজ্জিত বিজি প্রহরীগণ সম্রাটের শয়নকক্ষ পাহারা দিত এবং মহলকে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করতো। বিজি প্রহরীগণ ছিলেন শান্ত, কর্মক্ষম এবং সম্রাটের খুবই আস্থাভাজন। সম্রাট এবং মহলের নিরাপত্তায় তারা সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করতো।

খোঁজা প্রহরী

হারেমের বাহিরে খোঁজা প্রহরীরা পাহারা দিতেন। মোগলদের সময় তারা খোঁজা সারা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বয়োজৈষ্ঠ খোঁজাদের নাজির বলা হতো। একজন নাজিরের অধীনে অনেকগুলো খোঁজা দলবদ্ধ থাকতো। নাজিরগণ তাদের অধীনস্ত খোঁজাদের নিয়ে মহলের বাহিরে পাহারা দিত। সকল নাজিরদের যিনি প্রধান ছিলেন তার উপাধি ছিল আইত মাত খান বা আইত বরখান।[৮৭] মধ্যযুগে ভারত ও অনেক মুসলিম দেশে খোঁজা ও ক্রীতদাস কেনাবেচা হতো। অনেক সময় দেশের বাহির হতে তাদের আমদানী করা হতো। বঙ্গদেশেও পুরুষকে খোঁজা করা একটি সাধারণ প্রথা হিসেবে চালু ছিল।[৮৮] সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে গোটা সাম্রাজ্যে পুরুষকে খোঁজা করা নিষিদ্ধ করেন।[৮৯] খোঁজাদের কোন স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ও উত্তরাধিকারী থাকতো না। সম্রাট আকবর একবার আঁতাতায়ীর আক্রমণের শিকার হন। সে সময় খোঁজা প্রহরীরাই তাকে প্রাণে রক্ষা করেছিলেন। এ জন্য আকবর খোঁজাদের সাথে খুব ভাল আচরণ করতেন। সম্রাট আকবর হতে পরবর্তী সকল সম্রাটগণই তাদেরকে যথেষ্ট বিশ্বাস

করতেন। খোঁজা প্রহরীরা সূর্য ডুবার পরেই মহলের সকল দরজা বন্ধ করে দিত। সম্রাটদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য মহলের প্রবেশ মুখে তারা সর্বদা সতর্ক পাহারা দিত।[৩০] কোন অনাকাংখীত দৈব্য ঘটনা ঘটলে তার দায় খোঁজাদের উপর বর্তাতো। কারণ হারেমের বাহিরের নিরাপত্তার পুরোপুরি তাদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

রাজপুত প্রহরী

হারেমের অধিক নিরাপত্তার জন্য রাজপুত সৈন্যদল দূর্গের বাইরে মোতায়েন থাকত। এর সাথে আমীরদের সৈন্যদলও নিযুক্ত থাকত। প্রহরায় নিযুক্ত সৈন্যদের খাবার সম্রাট কর্তৃক সরাবরাহ করা হত। যদি কোন সৈনিক অনুপস্থিত থাকত তবে তার বেতন কাটা হত ও জরিমানা আদায় করা হতো। রাজপুত সৈন্যদের নিয়োগের প্রথা আকবরের সময় হতে শুরু হয়। পরবর্তী সময়েও এটা চালু ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সময় যখন মারাঠারা জাহান বানু বেগমের তাবু আক্রমন করেছিল তখন অনুরুদ্ধ সিংহ এর অধীনে রাজপুত সৈন্যরা তা প্রতিহত করেছিল। তাদের সাহসিকতার জন্য জাহান বানু বেগম জনসম্মুখে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি তার মুক্তার হার খুলে অনুরুদ্ধ সিংহের গলায় পরিয়েছিলেন।[৩১] প্রহরীরা দিনে একবার তাদের দায়িত্ব পরিবর্তন করত। রাজপুত্র ও আমীরদের অশ্বারোহী প্রহরীরা সন্ধ্যা পাঁচটার সময় থেকে প্রহরা দিত এবং প্রতি ২৪ ঘন্টা পরপর দায়িত্ব পরিবর্তন করত। একইভাবে মহলের মহিলা প্রহরীরা দিনের শেষে প্রহরা পরিবর্তন করত। প্রতিদিন বিকাল পাঁচটার সময় তারা সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করত এবং প্রস্থান করত।[৩২] সব মিলিয়ে মোগল হারেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুবই সুশৃংখল।

হারেমের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা

হারেমের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সম্রাটের ভাল সম্পর্ক ছিল। তারা সম্রাটকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। সম্রাটও তাদের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তাদের ভাল বেতনভাতা, বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সম্রাটগণ উদার ছিলেন। হারেমের ভিতর তাদের ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদনসহ অমোদ-প্রমোদের সকল আয়োজন ছিল। মহিলা কর্মকর্তাগণ সুন্দর পোষাক ও গহণাপত্র পরিধান করতেন। সুন্দর সাজ-সজ্জা ও পরিপাটি করে চলাফেরা করতেন। সম্রাট আকবরের সময় একজন মুসরিফ বা মেট্রন মাসে ১০২৮ হতে ১৬১০ টাকা বেতন ভাতা পেতেন। মধ্যম শ্রেণীর কনিষ্ঠ কর্মচারীরা ২০ হতে ৫০ টাকা এবং নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা ২ হতে ৪০ টাকা বেতনভাতা দেয়া হতো। এমনকি আকবরের সময় একজন কর্মচারীকে মাত্র ২ টাকা বেতনভাতা প্রদান করাকে খুব কম বলে বিবেচিত হতো না।[৩৩] সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর বা মধ্যম শ্রেণীর একজন কর্মচারীর বেতনভাতা ৩০০ হতে ৪০০ টাকা দেয়া হতো। তৃতীয় বা নিম্নশ্রেণীর

কর্মচারীকে ৫০ হতে ২০০ টাকা বেতন দেয়া হতো। [১৪] নির্দিষ্ট বেতন ভাতা ছাড়াও হারেমের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সম্রাট, বেগম, শাহজাদা ও শাহজাদী, আমীরদের নিকট থেকে নগদ অর্থ ও উপহার পেতেন।

পরিশেষে বলা যায়, মোগল হারেমের মহিলারা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসিতার মধ্যে বসবাস করতেন। মোগল সম্রাটগণ হারেমের মহীয়সীদের জন্য অত্যন্ত বিলাসবহুল প্রাসাদ ও মহল নির্মাণ করেছিলেন; যা আজও দিল্লী, আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি ও লাহের দূর্গে আমরা দেখতে পাই। হারেমে বসবাসকারী মহীয়সী নারীদের জীবনের সকল উপায়-উপকরণ, সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্রাটগণ করেছিলেন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল হারেম এক বিস্ময় ও কৌতুহলের বিষয় হয়ে আছে।

তথ্যপঞ্জী :

১. মোগল সম্রাটগণ হলেন- জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০), নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ন (১৫৩০-১৫৪০; ১৫৫৫-১৫৫৬), জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), নূর উদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭), শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮), মহি উদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭),মোয়াজ্জেম; বাহাদুর শাহ প্রথম ও শাহ আলম প্রথম উভয় নামে পরিচিত (১৭০৭-১৭১২), আওরঙ্গজেবের ৫ ছেলে ছিল- মোহাম্মদ, মোয়াজ্জেম, আযম শাহ, আকবর ও কমরবক্স। আওরঙ্গজেবের বড় ছেলে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের সময় চাচা সূজার পক্ষাবলম্বন করায় আওরঙ্গজেব তাকে বন্দীকরেন। মোয়াজ্জেম ৬৪ বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৭১৩), ফারুক শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯); জাহান্দার শাহের ভাই আজি উস শানের ছেলে। রফি-উদ-দৌলা (১৭১৯- ফেব্রুয়ারী-জুন), রফি-উদ- দারাজাত (১৭১৯ জুন- সেপ্টেম্বর), মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮), আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯), দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬); তার আসল নাম আলী গওহর। আকবর শাহ দ্বিতীয় (১৮০৬-১৮৩৭) বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়) জাফর (১৮৩৭-১৮৫৭) তিনি ছিলেন মোগল বংশের শেষ সম্রাট। তার পদবী ছিল আবু মোজাফ্ফর সিরাজ উদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ বাদশাহ গাজী। মোগল সম্রাটদের মধ্যে প্রথম ছয়জন ছিলেন বিখ্যাত। পরবর্তী শাসকগণের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার কারণে মোগল বংশের পতন হয়। এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭) পৃ. ২৫১।
২. এ কে এম শাহ নাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭) পৃ. ১৬।
৩. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডচিত্র*, (ঢাকা : অ্যাডন পাবলিকেশন, ২০০৫) পৃ. ৯৯।
৪. জহীর উদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা*, ১ম খন্ড প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪) পৃ. ৬
৫. তদেব, পৃ. ১০।
৬. গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৭০) পৃ. ৫-৬।
৭. তেমুজীন অর্থ: কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত। *Encyclopaedia of Islam*, v. II, p. 41
৮. হ্যারল্ড ল্যাম, *চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গল বাহিনী*, নূর আহমেদ খান অনূদিত, (ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স-১৯৯৪) পৃ.৮৪।

৯. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস,* (ঢাকাঃ চয়নিকা, ২০০৭) পৃ. ৪১।

১০. Jawaharlal Nehru, *Glimes of World History* (New Delhi: Oxford University press, 1983), p. 218.

১১. F.G. Pearce, *An Outline History of Civilization,* (Calcutta: Oxford University press, 1965), p. 801.

১২. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস,* পৃ. ৪৪-৪৬।

১৩. Lane Poole, *The Mohammaden Dynsties,* (New York: Fredenick Ungar Publishing Co. 1965), p. 202.

১৪. হ্যারল্ড ল্যাম, *দিগ্বিজয়ী তাইমুর,* আবুল কালাম শামসুদ্দীন অনূদিত, (ঢাকাঃ রায়হান পাবলিশিং ১৯৬৫), পৃ. ৭৮।

১৫. প্রেমময় দাশগুপ্ত, *ট্যাভানিয়ারের দেখা ভারত,* (কলকাতাঃ ফর্মা কে এল এম প্রাইভেট লিঃ ১৯৮৪), পৃ. ২২৯।

১৬. গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস,* পৃ. ২৭।

১৭. তাইমুর ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিজম ও হেরাত, ১৩৮৬ খ্রিঃ মুলতানিয়া, ১৩৮৯ খ্রিঃ খারস, ১৩৯২ খ্রিঃ তাব্রিজ, ১৩৯৩ খ্রিঃ জর্জিয়া, ইরাক, মিশর ও দক্ষিণ রাশিয়া, ১৩৯৮ খ্রিঃ ভারত, ১৪০১ খ্রিঃ দামস্ক, ১৪০২ খ্রিঃ তুর্কী সুলতান বায়েজিদকে পরাজিত করে তুর্কী সাম্রাজ্য জয় করেন। গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস,* পৃ. ২৯-৩৩।

১৮. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৬-১৭।

১৯. কেউ কেউ মনে করেন তিনি যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাতে খোঁড়া হয়েছিলেন।

২০. গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস,* পৃ. ৩৬।

২১. জহীর উদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা,* পৃ. ৬-৭।

২২. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন,* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ১৭৬।

২৩. জহীর উদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা,* পৃ. ৪৭-৪৯।

২৪. তদেব, পৃ-১১৭।

২৫. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা,* (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লি. ১৯৭৯) পৃ. ২০৯।

২৬. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা,* মোস্তফা হারুন অনূদিত, (ঢাকাঃ *বাংলা একাডেমী,* ১৯৭৮), পৃ. ৩।

২৭. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন,* পৃ. ১৭৮।

২৮. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস,* পৃ. ২৪।

২৯. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুন নামা,* পৃ. ৯-১০।

৩০. মোঃ মামুনর রশিদ, মোগল আমলে প্রাসাদ রাজনীতি, (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ) অপ্রকাশিত *পিএইচডি থিসিস,* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ৬০।

৩১. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস,* পৃ. ২৯।

৩২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৪-১৫; আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, পৃ. ১৮৪-৮৫।
৩৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খন্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬) পৃ. ৪৫৩।
৩৪. আবুল ফজল জামাল উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে মোকাররম, *লিসানুল আরাব*, ১২শ খন্ড, (বৈরুতঃ দারুস ছাদির, ১৯৬৫), পৃ. ১১৯।
৩৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খন্ড, পৃ. ৪৫৩।
৩৬. অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ*, (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮) পৃ. ১৮৯।
৩৭. মাহমুদ শামসুল হক, মুঘল হারেম- অন্দরের ইতিবৃত্ত, (ঢাকাঃ *জনকণ্ঠ ঈদ সংখ্যা*, ২০০৭), পৃ. ৩০৯।
৩৮. আবু সুফিয়ান (যাকী), *ফরহাঙ্গে জাদীদ*, (ঢাকাঃ রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮) পৃ. ৩৭৬।
৩৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খন্ড, পৃ. ৪৫৩।
৪০. Amir Ali, The Influence of Woman in Islam, (London: *Royal Asiatic Society*, 1899). p.51; ফিলিপ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, জয়ন্ত সিংহ ও অন্যান্য অনূদিত, (কলিকাতাঃমল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯) পৃ. ২৫৭-৫৮।
৪১. রুবেন লেভী, *সোসল স্ট্রাকচার অব ইসলাম*, গোলাম রসূল অনূদিত, (কলিকাতাঃ মলিক ব্রদার্স ১৯৯৫) পৃ. ৮৫;। সাযযাদ কাদির, *হারেমের কাহিনী জীবন* ও যৌনতা, (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ,২০০৭) পৃ. ৪৮-৪৯।
৪২. *আল কোরআন*, সূরা-২৪, আয়াত ৩০,৩১; সূরা-৭, আয়াত-২৬, সূরা-৩৩, আয়াত-৫৯।
৪৩. রুবেন লেভী, *সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম*, পৃ. ৮৫।
৪৪. গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বের হতো না, যাবতীয় কাজ তারা বাড়ির ভিতরেই সমাধা করতো। মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,১৯৯৮) পৃ.৯।
৪৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ.১।
৪৬. কে এম আশরাফ, *হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা*, (কলিকাতাঃ পাল পাবলিশার্স, ১৯৮০) পৃ. ৯।
৪৭. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৫।
৪৮. *বাংলা পিডিয়া*, ১০ম খন্ড, (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) পৃ. ৪৫৪।
৪৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৫।
৫০. যে নারী বিবাহ ব্যতীত কোন পুরুষের সাথে স্ত্রী রুপে বসবাস করে তারাই সাধারণত উপপত্নী হিসেবে পরিচিত। মোগল সম্রাটগণ বিভিন্ন সময়ে পাওয়া উপহার ও যুদ্ধবন্দী কৃতদাসী নারীদেরকে হারেমে উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে তারা বৈধভাবে বিবাহিত ছিলেন না। দাস প্রথার ধারণা থেকেই ক্রীতদাসী হিসেবে তাদেরকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করা হতো। কোন কোন সম্রাট তাদেরকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদাও প্রদান করেছেন। উপপত্নীদের গর্ভের সন্তান ছিলেন স্বাধীন; বৈধ স্ত্রীদের সন্তানের মত তারা সমমর্যদায় গণ্য হত। (K.S. *Lal, The Mughal Harem*, p. 29; Soma Mukharjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution* p. 24.)
৫১. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৫।
৫২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৬-১৭।

৫৩. শাহনাজ কামাল, *মোগল মহলে*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃ. ৩-৫।
৫৪. তদেব, পৃ. ১৩।
৫৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯।
৫৬. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*,পৃ. ৩৭।
৫৭. Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, (tr.) H. Blockman,(Calcutta: Asiatic Socity of Bangal, 1873), Vol. 1, p. 46.
৫৮. Abul Fazl, *Akbar Nama*,(tr.) H. Beveridge; (Calcutta: Asiatic Socity of Bangal, 1912) Vol. II, pp. 335-36.
৫৯. Percy Brown, *Indian Architecture (Islamic Period)* (Bombay: D.B Tanaporevala sons and co. 1981,) p. 100.
৬০. Richard Burn, *Cambridge History of India,The Mughal Period* (Cambridge: University Press,1937),IV, pp. 538-42.
৬১. Rechard Burn, *Cambridge History of India*, IV, p. 556.
৬২. Nur-ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri*, (tr.)Alexander Rogers and Henry Beveridge,(Delhe:Low Press Pablication,1989), vol. I, p.12.
৬৩. William Foster, *Early Travels in India* (London: Oxford University press, 1921). p.56.
৬৪. Nur-ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri*, Vol.1,p. 3.
৬৫. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, (New Delhi; Aditya Parakashan, 1988), p. 61.
৬৬. S.A.A Rizvi, *History of Shahjahan of Delhi,(*Allahabad: The Indian Press Ltd. 1932.), p. 308.
৬৭. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 64.
৬৮. *Ibid.*
৬৯. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 61.
৭০. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, (tr.) Willam Irvine, (London: John Marray, 1906),Vol. I, p.220.
৭১. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*,Vol. 1, pp. 45-47.
৭২. M.A. Ansari, *Social Life of the Mughal Emperors* (New Delhi: Gitanjali Publishin House, 1983), p.69.
৭৩. Abul Fazl, *Ain-i- Akbari (tr.)*, 1, p. 46.
৭৪. Nur ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri*, vol. II, p. 216.
৭৫. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*,(New Delhi:Gayan publishing house,2001) p. 37.
৭৬. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 52.
৭৭. Rekha Misra, *Women in Mughal India*, (Delhi: Oriental Publishers and Booksellers, 1967), p.78.
৭৮. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 52.
৭৯. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution* p. 37.; K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 52.
৮০. Soma Mukharjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribtuion*, p. 37.
৮১. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.52.

৮২. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution*, p.37.
৮৩. *বাংলা পিডিয়া*, ১০ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৫৪.
৮৪. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.53.
৮৫. তদেব, পৃ. ৫২.
৮৬. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar, (tr.)* William Irvine, , (London: Jhon Murray, 1996), vol. II, pp. 42, 43.
৮৭. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.56.
৮৮. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, Vol. II, p. 314.
৮৯. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib*, (Calcutta: Orient Longman, Ltd. 1912), Vol. III, p. 61.
৯০. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, Vol. II. p. 352.
৯১. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib*, Vol. III, p. 61.
৯২. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, Vol. II. p. 352.
৯৩. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 55.
৯৪. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, vol. II, p. 330.

তৃতীয় অধ্যায়
হারেম ও মোগল নারী

হারেম প্রথার ধারণা উমাইয়া আমল থেকে চালু হলেও মোগল শাসনামলে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বিশেষ করে মোগল সম্রাট আকবরের অর্ধশতাব্দী শাসনামলে হারেম প্রথার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তিনি হারেমের সৌন্দর্য বর্ধনে বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের সন্নিবেশ করেন। তাদের জীবন যাপন ও নিরাপত্তার জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত সকল শাসক মোগল হারেমের সুখ্যাতি, মর্যাদা ও ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করেন। মোগল হারেমের অধিবাসী, তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, আনন্দ-বিনোদ, সামাজিক মর্যাদা, পর্দা, ধর্মচর্চা এক কথায় হারেমের আভ্যন্তরীন কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা রকম কল্প কাহিনী প্রচলিত আছে। এ সব কল্পকাহিনীর তেমন কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। এ অধ্যায়ে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পন্থায় মোগল হারেমে বসবাসকারী নারীদের সঠিক জীবনচিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

হারেমে মোগল সম্রাটদের স্ত্রীগণ

মোগল হারেমে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মহিলারা বসবাস করতেন। এদের মধ্যে সম্রাটদের স্ত্রীগণই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতেন। সকল মোগল সম্রাটদের একাধিক স্ত্রী ছিল। কিন্তু সকল স্ত্রীগণই সমান শ্রদ্ধা ও সুযোগ সুবিধা পেতনা। সাধারণতঃ প্রধান স্ত্রী বেশী জাঁকজমকের সাথে প্রশস্ত মহলে বাস করতেন। অন্যান্য স্ত্রীগণও সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মহলে বসবাস করতেন। হারেমে যিনি সবচেয়ে বেশী কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন তাকে 'বাদশা বেগম' বলা হতো। সম্রাট আকবরের সময় হতে হারেমের মহীয়সীদের এই উপাধী দেওয়া হয়।

সম্রাট বাবরের স্ত্রীগণ

সম্রাট বাবর শুধুমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না মোগল হারেমের সূচনাও তারই কৃতিত্ব। স্বীয় স্ত্রীদের মর্যাদা রক্ষা, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস ও আভিজাত্যের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে তিনি এ প্রয়াস শুরু করেন। সম্রাট বাবরের জীবনে বেশ কজন গুণী স্ত্রীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের কেউ কেউ অকালে মারা গেলেও অবশিষ্টদের দ্বারা বাবর বিভিন্ন সময় রাজনৈতিকভাবেও উপকৃত হয়েছেন। তার স্ত্রীগণ হলেন- আয়েশা সুলতান বেগম, মাসুমা সুলতান বেগম, জয়নব সুলতান বেগম, মাহম বেগম, গুলরুক বেগম, দিলদার বেগম ও বিবি মোবারিকা। এছাড়াও তার গুরুত্বপূর্ণ উপপত্নী হলো গুলনার আগাচা ও নারগুল আগাচা।[১] এরা ছিলেন সির্কাসিয়ান দাসী; যাদেরকে পারস্য সম্রাট শাহ থাহমাস বাবরকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন।

বাবরের স্ত্রীদের মধ্যকার তিনজন ছিলেন তৈমুরিয় কন্যা। তারা হলেন আয়েশা সুলতান বেগম, মাসুম সুলতান বেগম ও জয়নব সুলতান বেগম।[২] সম্রাট বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা ও মাতা কুতলুগ নিগার খানম পছন্দ করে বাবরকে অতি অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন সমরকন্দের সমাজপতি সুলতান আমমেদ মির্জার কন্যা আয়েশা সুলতান বেগমের সাথে। বাবর সিংহাসন লাভের পর ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে খোজেন্দের যুদ্ধের পর মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে আয়েশাকে প্রথম বধূ করে নিজ বাড়িতে আনেন। আয়েশার গর্ভে বাবরের প্রথম কন্যা ফকরুন নিসা জন্ম লাভ করে। এক মাস পরেই শিশুকন্যাটি মারা যায়।[৩] আয়েশার সাথে বিয়ের তিন বছর পর বাবরের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

অতঃপর ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর আয়েশার ছোট বোন মাসুম সুলতান বেগমকে বিয়ে করেন। বাবর উজবেগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কাবুলের হেরাতে এসেছিলেন তৈমুরীয় শাসকদের সাহায্য ও সমর্থন লাভের জন্য। এ সময় তিনি শ্যালিকাকে বিয়ে করেন। এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনিও মারা যান। বাবর মাতৃহারা মেয়ের নাম রাখেন মাসুমা বেগম।[৪] পরবর্তীকালে হেরাতের সুলতান হুসেনের নাতি মুহাম্মদ জামান মির্জার সাথে মাসুমার বিয়ে হয়। জয়নব সুলতান বেগমকে কাবুল জয়ের পর বাবর বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন হিসারের সুলতান মাহমুদ মির্জার কন্যা। গুলরুখ বেগম ছিলেন বাবরের অন্যতম স্ত্রী। তার গর্ভে কামরান মির্জা, আসকারী মির্জা, শাহরুখ মির্জা, সুলতান মির্জা নামে চার পুত্র এবং গুলগাদার নামে এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে।[৫]

দিলদার বেগম ছিলেন বাবরের আরেক স্ত্রী। তার গর্ভে দুই ছেলে আলওয়ার, হিন্দাল এবং তিন মেয়ে গুলরং, গুলচিহরা ও গুলবদন জন্ম লাভ করেন। বাবরের উপর দিলদারের ব্যাপক প্রভাব ছিল। দিলদারের তিন কন্যার মধ্যে গুলবদন বেগম মোগল হারেমে পরবর্তী জানানাদের পথিকৃৎ ছিলেন।[৬] রাজনৈতিক ব্যাপারে বাবর দিলদারের সাথে পরামর্শ করতেন। তার প্রভাব ও পরামর্শেই বাবর হিন্দালকে পরবর্তী উত্তরাধীকারী মনোনীত করেছিলেন। দিলদার স্বামীর বদান্যতায় খুবই খুশি ছিলেন।

মাহম বেগম ছিলেন ছিলেন হেরাতের হুসেন পরিবারের মেয়ে। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ২১ বৎসর বয়সে তাকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে জন্ম লাভকারী হুমায়ন ছাড়া সবাই অকালে মারা যান। যারা মারা যান তারা হলেন বারবুল মির্জা, ফারুক মির্জা, মিহরজান বেগম, ও ইসান দৌলত বেগম। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে কাবুল দুর্গে হুমায়নের জন্ম হয়। মাহম বেগম সপত্নী সন্তানদের অত্যন্ত আদর-স্নেহ করতেন। হিন্দাল ও গুলবদন তাকে মা বলেই জ্ঞান করতেন। আসলে মাহম বেগম নিজের চারজন সন্তানকে হারিয়ে দিলদারের ছেলে হিন্দাল ও মেয়ে গুলবদনের লালন পালনের ভার গ্রহণ করে সন্তান হারানোর ব্যাথা ভুলতে চেয়েছিলেন।[৭] বিবি মোবারিকা ছিলেন আফগানিস্তানের ইউসুফ জাই সম্প্রদায়ের মেয়ে। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে বাবর তাকে বিয়ে করেন। রাজনৈতিক কারণে মোবারিকার গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক বেশী।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারত জয় করেন। বাবর তার পরিবার পরিজন কাবুল হতে আগ্রায় নিয়ে আসেন। গোটা ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বাবর জন্য ব্যস্ত তখন খবর আসে তার প্রিয় পুত্র হুমায়ন খুবই অসুস্থ্য। বাবর ব্যাকুল হয়ে হারেমে ফিরে আসেন। মহান প্রভূর নিকট নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রাণ ভিক্ষা চান। তার প্রার্থনা কবুল হয়েছিল। হুমায়ন সুস্থ্য হয়ে উঠেন আর তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর বাবর মারা যান। তাকে ভারতের মাটিতেই সমাহিত করা হয়। পরবর্তীকালে বিবি মোবাবিকা তার কবর আরামবাগ হতে কাবুলে স্থানান্তরিত করেন।

সম্রাট হুমায়নের স্ত্রীগণ

মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ন বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। সম্রাট হুমায়নের প্রধান স্ত্রীগণ হলেন, বিগা বেগম বা হাজী বেগম, হামিদা বানু বেগম, মাহচুচাক ও মেওয়াজান বেগম। এ ছাড়াও গুনওয়ার ও কানিস আগা ছিলেন তার উপপত্নী।[৮] হুমায়ন বিশ বছর বয়সে বিগা বেগম বা হাজী বেগমকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে আল আমান নামে এক পুত্র সন্তান এবং আকিকা নামে এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেন। হাজী বেগম ছিলেন হুমায়নের হারেমের প্রধান কর্ত্রী।

হুমায়নের সাথে ১৪ বৎসর বয়সে হামিদা বানু বেগমের বিয়ে হয়। পারস্যের এ মহীয়সীর গর্ভেই ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে ২৫ অক্টোবর আকবরের জন্ম হয়। এ সময় হুমায়ন শের শাহের নিকট পরাজিত হয়ে রাজ্যহারা অবস্থায় ভবঘুরের ন্যায় ঘুরছিলেন। আকবরের জন্মের ঘটনা রীতিমত শিহরণ জাগায়। শের শাহের ভয়ে হুমায়ন যখন অন্তঃস্বত্ত্বা হামিদা বানুকে নিয়ে শিহওয়ান হয়ে অমর কোটের দিকে যাচ্ছিলেন। রাজস্থানের কন্টকময় মরুভূমির পথ বেয়ে অবশেষে অবসন্ন দেহে হুমায়ন হামিদা বানুকে নিয়ে অমরকোটের একটি দূর্গে উপস্থিত হন। সেখানে হামিদা বানুর প্রসব বেদনা ওঠে। অমর কোটের দূর্গে আকবরের জন্ম হয়।[৯] এ সময় হুমায়ন কপর্দকহীন ছিলেন । তার নিকট মৃগনাভী কস্তরি ছাড়া কিছুই ছিলনা। হুমায়ন সেটিই অনুরাগীদের মাঝে বিতরণ করে মহান প্রভূর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তার এ সন্তানের মহিমা যেন সারা দুনিয়ায় কস্তরির সৌরভের মত ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর এ মহীয়সী নারীকে 'মরিয়ম মাকানী' উপাধীতে সম্মানিত করা হয়েছিল। [১০]

হুমায়ন মেওয়াজান নামে আরো এক রাজকর্মচারীর মেয়েকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন চৌসার যুদ্ধে শের শাহের নিকট পরাজিত হয়ে সিন্ধু দেশে পালিয়ে যাবার সময় যমুনা নদীতে ডুবে মারা যাবার উপক্রম হয়েছিলেন। এ সময় হারেমের অনেকেই ডুবে মারা যান।[১১] নিজামউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি হুমায়নকে প্রাণে বাঁচান। হুমায়ন পরবর্তীতে তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে এক

দিনের জন্য দিল্লীর সম্রাট বানিয়েছিলেন। হুমায়ন রাজ্যহারা হয়ে দীর্ঘ ১৫ বৎসর পলায়ন ও নির্বাসিত ছিলেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দূর্ভাগ্যক্রমে পরের বছর তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান।

সম্রাট আকবরের স্ত্রীগণ

মোগল সাম্রাজ্যের কিংবদন্তী সম্রাট জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর ইতিহাসের অন্যতম একজন শাসক। হুমায়নের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে আকবর সিংহাসনে বসেন। আকবরের অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খান দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রোকেয়া সুলতান বেগম সম্রাট আকবরের প্রথমা স্ত্রী।[১২] মাত্র আট বছর বয়সে আকবরের সাথে মির্জা হিন্দালের মেয়ে রোকেয়া সুলতান বেগমের বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ বছর পর হুমায়ন মারা যান। রোকেয়ার গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে রোকেয়া বেগম মৃত্যু বরণ করেন। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর দ্বিতীয় বিয়ে করেন আমত্য আব্দুল্লাহ খানের মেয়ে কাশিম বাণুকে। তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন। ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর অম্বরের রাজা বীরমলের কন্যা হারকাকে বিয়ে করেন।[১৩] তিনি 'যোধবাই' 'যোধাআকবর' 'মানমতি' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে রাজ্যশাসনে আকবরের অভিষেক ঘটে। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন রাজপুতদের সমর্থন ছাড়া মোগল শাসন টিকে রাখা কঠিন। তাই তিনি রাজপুত কন্যাদের বিয়ে করা এবং তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কৌশল গ্রহণ করেন। ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আকবর সন্তান লাভের আশায় আজমীরে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরবারে দোওয়া চাইতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি যোধবাইকে বিয়ে করেন। বিয়ের সাত বছরেও তার কোন সন্তান না হওয়ায় আকবর বিখ্যাত দরবেশ সেলিম চিশতির দরবারে যান। দরবেশ তাকে পুত্র সন্তানের ভবিষ্যৎবাণী করেন। যোধবাইয়ের গর্ভে আকবরের প্রথম পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।[১৪] আকবর সেলিম চিশতির নামানুসারে তার নাম রাখেন মোহাম্মদ সেলিম। মৃত্যুর পর তাকে বাদশাহী খেতাব 'মরিয়াম-উজ-জামানী' (The Mary of the Age) উপাধী দেয়া হয়।[১৫]

সেলিমা সুলতান বেগম ছিলেন একজন বিধবা মহিলা। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খানের সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের তিন বছর পর স্বামী বৈরাম খান মারা যান। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তাকে বিবাহ করে মোগল হারেমে আনেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ গুণবতী একজন মহিলা। আকবরের হারেমে তার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সম্রাট আকবর আব্দুল ওয়াশীর সুন্দরী বিধবা স্ত্রী, মীরন মোবারক শাহের কন্যা, বিকানীর রাজা কানহানের কন্যা, জয়শলমীরের হার রায়ের কন্যা, মারওয়ার রানা উদয় সিংহের বোন, মিত্রা এবং ডংগা পুরের রাজপুত কন্যাকে আকবর বিয়ে করে মোগল হারেমে তোলেন।[১৬] এদের অনেকের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়না।

সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য এসব রাজপুত কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়েছিল। তারা আকবরের হারেমকে আলোকিত করেছিল। আকবরের স্ত্রীদের গর্ভে যে সব সন্তান জন্মলাভ করেন তার মধ্যে পুত্র সেলিম ও কন্যা আরাম বানু ছাড়া প্রায় সকলেই শিশু বয়সেই মারা যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রীগণ

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ৩৮ বৎসর বয়সে নূর উদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তার স্ত্রীগণের নামের তালিকা বেশ লম্বা। তাদের সংখ্যা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি অনেক রাজপুত হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মানবাই জাহাঙ্গীরের প্রথমা স্ত্রী। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর তাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন অম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা। জাহাঙ্গীর ভগবান দাসকে উপঢৌকন হিসেবে ২ কোটি মুদ্রা আর ভগবান দাসও জামাইকে বিপুল পরিমান উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর বিয়েতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাকে শাহ বেগম উপাধী দিয়েছিলেন। তার গর্ভে পুত্র খসরু এবং এক কন্যা সুলতানুন্নেছা জন্মলাভ করে।[১৭] তিনি ছিলেন খুবই আবেগী। শাহজাদা খসরু যখন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তিনি আত্মহত্যা করেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর বিকানীর রাজা রায় সিংয়ের কন্যাকে বিয়ে করেন। তার নাম জানা যায়নি। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে জাহাঙ্গীর যোধবাই বা জগতগোসাইকে বিয়ে করে হারেমে আনেন। তিনি ছিলেন উদয়সিংয়ের কন্যা, মারওয়ারের রাজা মালদেবের নাতনী। তার গর্ভেই খুররম বা (শাহজাহানের) জন্ম হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারী। জাহাঙ্গীরের জীবনকালেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাকে 'বিলকিস মাকানি' উপাধী দেয়া হয়। এছাড়াও জাহাঙ্গীর রাজ কুমারী করমসী, জগৎ সিং এর কন্যা, রাওয়াল ভীমের কন্যা, ছোট তিব্বতের শাসক আলী রায়ের কন্যা, রামচন্দ্র বান্দেলার কন্যা, খাজা হাসানের কন্যা, নুরুন নেছা বেগম, সালেহা বানু, কাশেম খানের কন্যা, মোবারক চক এর কন্যা হোসাইন চকের কন্যাকে বিয়ে করেন।[১৮] এদের অনেকের নাম পাওয়া যায়না। এদের মধ্যে খাজা হাসানের কন্যা সাহেব-ই জামালের গর্ভে শাহজাদা পারভেজের জন্ম হয়।

জাহাঙ্গীরের স্ত্রীদের মধ্যে নূরজাহান ছিলেন সবচেয়ে আলোচিত ও গুণবতী নারী। মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা মেহের উন নিসা জাহাঙ্গীরের হারেমে হয়ে উঠেন 'নূরমহল' 'নূরজাহান' বা জগতের আলো।[১৯] যৌবনকালেই শাহজাদা নূরজাহানের রুপ আর গুণে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু নূরজাহান একজন সাধারণ রাজকর্মচারীর মেয়ে হওয়ার কারণে আকবর তার সম্পর্ক মেনে নেয়নি। কৌশলে নূরজাহানকে জাহাঙ্গীরের চোখের আড়াল করা হয়। নূরজাহানের বাবা মির্জা গিয়াস বেগ ভাগ্যের অন্বেষনে ভারতবর্ষে আসেন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে নূরজাহানের জন্ম হয়।[২০]

এ সময় মির্জা গিয়াস বেগের অবস্থা তখন এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তিনি তার সদ্যজাত মেয়েকে রাস্তার পাশে ফেলে রাখেন। এ সময় একদল বণিক শিশুটির কান্না শুনে তাকে তুলে নেন। নূরজাহানের মা বণিকদের সাথে দেখা করে শিশুটির ধাত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। অবশেষে বণিকদলপতি সম্রাট আকবরের সঙ্গে মির্জা গিয়াস বেগের পরিচয় করে দিলে তিনি রাজকার্যে নিয়োগ পান। এভাবেই নূরজাহান বড় হন। সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীর এবং নূরজাহানের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে যথাশীঘ্রই নূরজাহানের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আলী কুলি বেগের সাথে নূরজাহানের প্রথম বিয়ে হয়। আলী কুলি বেগ বাঘ শিকার করে শের আফগান উপাধী লাভ করেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানের জায়গীরদার। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে আলী কুলি বেগ মারা যান। নূরজাহান স্বামীহারা হয়ে বাবার সংসারে ফিরে আসেন।[২১] ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর তাকে বিবাহ করেন। তিনি হন জাহাঙ্গীরের হারেমের প্রধান কর্ত্রী। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই মহিয়সী নারী মারা যান।[২২] লাহোরে তাকে সমাহিত করা হয়।

সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রীগণ

সম্রাট শাহজাহানের হারেমে প্রথম স্ত্রী হিসেবে আগমন করেন পারস্যের মির্জা মোজাফফর সাফারীর মেয়ে কান্দাহারী বেগম। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান তাকে বিয়ে করে মোগল হারেমে তোলেন। আরজুমান্দ বানু সম্রাট শাহজাহানের আরো এক স্ত্রী। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান তাকে বিয়ে করে হারেমে আনেন। তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি আসফ খানের মেয়ে। মোগল হারেমে প্রবেশের পর আরজুমান্দ বানু হন 'মমতাজ মহল'। সমকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিয়ে ছিল শাহজাহান ও মমতাজের বিয়ে। এ বিয়ে উপলক্ষে আগ্রা হতে দিল্লী পর্যন্ত অপরূপ সাজে সাজানো হয়। তিন দিন ব্যাপী আতশবাজী চলে। মমতাজ মহল ছিলেন রূপে গুনে এক অনন্য নারী। বিয়ের ২ বৎসর পর তিনি মা হন। তিনি শাহজাহানের সংগে ১৮ বৎসর সংসার করে মারা যান। এ সময়ে তিনি ১৪ সন্তান প্রসব করেন। তারপরেও তার শারীরিক সৌন্দর্য্যের ঘাটতি দেখা যায়নি। চর্তুদশতম সন্তান জন্মদানকালে ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে এ মহীয়সী নারী মারা যান।[২৩] শাহজাহান প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজকে এত বেশী ভালবাসতেন যে, তার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, সংসার বিমুখ হয়ে ফকির বেশ ধারণ করেন।[২৪] শাহজাহান তাকে 'মালিক-ই-জামান' উপাধীতে ভূষিত করেন। তার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ শাহজাহান স্মৃতিসোধ 'তাজমহল' নির্মাণ করেন। অবশ্য শাহজাহান মমতাজকে বিয়ের ৫ বছর পর তৃতীয় মহিষী হিসেবে আব্দুর রহিম খান-ই খাননের ছেলে শাহনেওয়াজ খানের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্ত্রীগণ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় যে সব নারী মোগল হারেম আলোকিত করেছিলেন তাদের মধ্যে দিলরাজ বানু বেগম অন্যতম। তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের প্রথমা স্ত্রী। ১৬৩৭

খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাকে বিবাহ করে হারেমে আনেন। তিনি ছিলেন পারস্যের শাহনেওয়াজ খান সাফারির মেয়ে। দিলারাজের গর্ভে তিন মেয়ে ২ ছেলে জন্মলাভ করে এবং আকালেই তারা মারা যান। এরপর আওরঙ্গজেব কাশ্মীরের রাজপুত কন্যা নবাব বাঈকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে প্রথম বাহাদুর শাহ মুহাম্মদ সুলতান, মুহাম্মদ শাহ আলম এবং বদরুন্নেছার জন্ম হয়।[২৫]

আওরঙ্গজেবের হারেমে আরো এক মহিষী হলেন আওরঙ্গবাদী। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। এরপর তার হারেমে উদয়পুরী মহলের আগমন ঘটে। একমতে সম্রাট তাকে জর্জিয়া থেকে দাসী হিসেবে আনেন। পরবর্তীকালে তাকে বিয়ে করে মোগল হারেমে স্ত্রীর মর্যাদান দান করেন।

আওরঙ্গজেব পরবর্তী মোগল হারেম

ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সফল সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব। বিশাল সাম্রাজ্যকে দক্ষতার সাথে শাসন করার মত যোগ্য নেতৃত্ব পরবর্তী মোগল সম্রাটদের মধ্যে আর দেখা যায়নি। আওরঙ্গজেবের পুত্র, প্রপৌত্ররা সবাই ছিলেন অদূরদর্শী। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১ জন শাসক দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের একজনও যোগ্যতা প্রদর্শন করে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব ও ঐক্য ফিরে আনতে পারেননি।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র শাহ আলম বা প্রথম বাহাদুর শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। বাহাদুর শাহ মারা গেলে তার বড় ছেলে জাহান্দার শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন বিলাসপ্রিয় ও কর্মবিমুখ। তিনিই সর্বপ্রথম 'লালকুয়ারী' নামক একজন হিন্দু নর্তকীকে বিবাহ করে মোগল হারেমে তোলেন।[২৬] লালকুয়ারীর প্রতি তিনি গভীর প্রেমমুগ্ধ ছিলেন। তিনি তাকে উচ্চপদ ও আর্থিক সুবিধা; তার আত্মীয়-স্বজনদের রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ-সুবিধা দান করেন। লালকুয়ারীর জন্য তিনি বার্ষিক দুই কোটি মুদ্রা বৃত্তি নির্ধারণ করেন। হারেমের সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তার হাতে ছেড়ে দেন। এতে মোগল হারেমের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়। তার বেশ ভূষা ও বিলাসদ্রব্যসহ যাবতীয় খরচ রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে পরিশোধ করা হতো।[২৭] সম্রাট তাকে 'ইমতিয়াজ মহল' উপাধী প্রদান করেন। লালকুয়ারীর বিলাসী জীবন-যাপন ও স্বেচ্ছাচারিতায় সম্রাটের প্রতি গভীর বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে জাহান্দার শাহ কে হত্যা করা হয়।

জাহান্দার শাহের মৃত্যুর পর ফররুখ শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি সৈয়দ ভাইদের একজনকে প্রধানমন্ত্রী অন্যজনকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান পদে বসান। তিনিও ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বলচেতা শাসক। সুন্দরীদের রানী হিসেবে পরিচিতি রাজপুত রাজা অজিত সিংহের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন।[২৮] ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়।

জাহান্দার শাহ হতে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত সময়কালে মোগল হারেমে আর কোন মহীয়সী গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারেন নি। আওরঙ্গজেব পরবর্তী মোগল সম্রাটদের ক্রমবর্ধমান কলহ, ধারাবাহিক প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অযোগ্যতা ও বিলাসিতার ফলে হারেমের পরিবেশ নষ্ট হয়ে পড়ে। সর্বোপরি সম্রাটদের পৃষ্টপোষকতার অভাব ও অনুপযোগী পরিবেশের কারনে হারেমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মোগল হারেমে আর কোন বেগম ও শাহজাদী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি।[২৯] সে সুযোগ ও ছিল না।

শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর সিংহাসন লাভ করে মোগলদের হৃত গৌরব ফিরে আনার ক্ষীণ সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। ইংরেজরা তাকে বন্দী করে বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠায়।[৩০] অত:পর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নির্বাসিত অবস্থাতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। মোগল ইতিহাসের শেষ পরিণতি প্রমাণ মেলে তার কবিতার চরণে-

'কিৎনি বদ নসিব হ্যায় জাফর
দাফন কি লিয়ে
দোগজ জমিন ভি মিল না সাকে
কু এ ইয়ার মে।'[৩১]

('জাফর তুমি কতই না হতভাগ্য। দাফনের জন্য তোমার প্রিয়/জন্মভূমিতে দু'গজ/ মাটি ও জুটলো না')

মোগল সম্রাটদের জীবনযাত্রায় তুর্কি ও পারস্য প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। ইসলামে প্রথাগতভাবে একাধিক বিবাহের অনুমতি থাকলেও একক বিবাহে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সকল স্ত্রীর প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে একাধিক বিবাহ বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে। ইসলামের এই প্রথাগত ঐতিহ্যকে ধারণ করে মোগল সম্রাটগণ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন। সম্রাট আকবর ইসলামের 'মুতা' বা চুক্তিভিত্তিক বিবাহ আইন সিদ্ধ করেছিলেন।[৩২] চুক্তিভিত্তিক বিবাহের মাধ্যমে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর অনেক রাজপুত নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়াও পারস্য ও তুর্কি শাসকদের অনুকরণে কৃতদাসীদেরকেও তারা উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মোগল সম্রাটদের একাধিক স্ত্রী ছিল এদের মধ্যে যিনি সর্ব জ্যেষ্ঠ ও প্রতিভাময়ী তিনি হারেমের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তাদের অনেকে 'বাদশা বেগম' উপাধী লাভ করেছিলেন। মোগল বেগমদের মধ্যে যারা এই উপাধি লাভ করেছিলেন তারা হলেন- রোকেয়া সুলতান বেগম, সেলিমা সুলতানা বেগম, নূরজাহান ও মমতাজ মহল।

সাধারণ বা অপ্রধান স্ত্রী

হারেমে রাজপুত নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। সম্রাট আকবর হিন্দু রাজপুত নারীদের সাথে বৈবাহিক চুক্তির মাধ্যমে ভারতে মোগল শাসন ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। হিন্দু রাজপুত রাজারা তাদের কন্যা, বোন ও অন্যান্য আত্মীয় সম্প্রদানের মাধ্যমে ভারতে মোগল শাসন ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সম্রাট আকবর ভারতে তার শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করতে এই নীতি গ্রহণ করেন। যে সব রাজপুত মহীয়সীরা মোগল হারেমে আগমন করেন তারা অপ্রধান স্ত্রী হলেও হারেমে তারা সম্রাটের স্ত্রী হিসেবে খুবই সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করতেন।[৩৩] এদের অনেকেই রাজমহিষী খেতাব লাভ করেছিলেন। তাদের গর্ভজাত সন্তানেরা শাহজাদা ও শাহজাদীর মর্যাদা লাভ করত। সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাট শাহজাহান রাজপুত মহীয়সীদের সন্তান ছিলেন। তারা পরবর্তী মোগল বংশের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উপপত্নী

মোগল সম্রাটগণ হারেমে উপপত্নী রাখতেন। তাদের সাথে কোন বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। হারেমে উপপত্নীদেরও মর্যাদা ছিল খুবই চমৎকার। ইসলামে অবিবাহিত অবস্থায় নারী পুরুষের মধ্যে সহবাস বৈধ নয়। তবে ইসলামের প্রথম যুগে যেসব মহিলা যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হত; তাদের সঙ্গে সহবাস বৈধ ছিল। মোগল সম্রাটগণ ইসলামের এই প্রথাকে ধারণ করে কৃতদাসী ও উপহার হিসেবে পাওয়া নারীদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাদের সাথে মেলামেশার ফলে যে সব সন্তান জন্মলাভ করতো তারা ছিল স্বাধীন।[৩৪] উপপত্নীরা হারেমে স্ত্রীর ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করতেন। সম্রাটদের মত অভিজাত আমীরগণেরও উপপত্নী ছিল। মধ্যযুগে হারেমে উপপত্নী রাখাকে অবৈধ বলে মনে করা হতো না।

সম্রাট আকবর স্ত্রীদের এবং উপপত্নীদের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। সম্রাট এবং আমীরগণ উপপত্নীদের সাথে খুবই খোলামেলা কথা বলতেন। উপপত্নীরা অনেক সময় স্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করতেন। তারা ছিল মুহূর্তের জন্য স্ত্রী। গুলনাহার আগাছা এবং নারগুল আগাছা ছিলেন বাবরের দুই বিখ্যাত উপপত্নী। তারা যদিও উপপত্নী ছিলেন কিন্তু তারা রাজপরিবারের স্বীকৃত মহিলা হিসাবে গণ্য হত। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুলবদনের সাথে গুলনাহার হজ্জে যান।[৩৫] হুমায়ুনেরও উপপত্নী ছিল। আকবরের ধাত্রীরা হুমায়ুনের উপপত্নী ছিলেন। সম্রাট আকবরেরও উপপত্নী ছিল। বিবি সালিমা ছিলেন একজন উপপত্নী শাহজাদা খানমের মা। শাহজাদা মুরাদ এবং দানিয়াল এর মা ছিলেন উপপত্নী। শাহজাদী সুকুরুন্নেছা বেগমের মা ছিলেন উপপত্নী। সুকুরুন্নেছা বেগম জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনি মোগল হারেমে

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আরাম বানু বেগম ছিলেন আকবরের ঔরসজাত উপপত্নীর কন্যা। শাহজাদা শাহরিয়ার জাহাঙ্গীরের এক উপপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬] শাহজাহানের উপপত্নীদের মধ্যে হতে দুইজন বিখ্যাত উপপত্নী হলেন আগবারাবাদী মহল এবং ফতেপুরী মহল। আওরঙ্গজেবের উপপত্নী ছিলেন আওরঙ্গবাদী মহল। স্ত্রী ও উপপত্নীদের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য ছিল। স্ত্রীগণ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু উপপত্নীরা বিশ্বাসী হতে পারতেন না। তাদের একটি মোহনীয় শক্তি ছিল। যা দ্বারা তারা অনেক সময় সম্রাটদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেন।[৩৭] শাহজাহান তার উপপত্নী ফতেপুরী মহলের স্মৃতি রক্ষার্থে দিল্লীতে ফতেপুরী মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

হারেমের মহীয়সীদের মর্যাদা ও উপাধী গ্রহণ

মোগল মহিলাদের জীবন সম্রাটকে ঘিরে আবর্তিত হতো। হারেমের সকল মহিলা সমান মর্যাদা পেত না। সম্রাটের জীবনে যে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারতো, হারেমে সে তেমন মর্যাদা পেত। সম্রাট যার উপর যত বেশি খুশি থাকতেন, তার মর্যাদা তত বেশি থাকতো। তাকে খুশি করার মাধ্যমে অনেকে সম্রাটের নিকট থেকে কাজ আদায় করে নিতেন। হারেমের মহিলারা পারস্পরিক বন্ধুভাবাপন্ন এবং আন্তরিক ছিলেন। কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও তা কেউ প্রকাশ করতো না। সবাই সম্রাটের সবচেয়ে প্রিয় হতে চাইতো। কেউ চাইতো না নিজের হিংসা বিদ্বেষ ঝগড়াটে ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ুক।[৩৮] সম্রাট বা শাহজাদাকে প্রথম পুত্রসন্তান উপহার দেওয়াটাকে সম্মান লাভের সবচেয়ে বড় উপায় হিসেবে মনে করা হতো। কোন বেগম যদি প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারতো, তবে তার মর্যাদা এমনিতেই বেড়ে যেত। প্রথম যুবরাজ সিংহাসনের দাবিতে এগিয়ে থাকতেন। তার মাতা স্বাভাবিকভাবেই বেশি সম্মান পেতেন। তাই এ নিয়ে হারেমে বেশ প্রতিযোগিতা হতো। হারেমের জীবনকে আনন্দের জীবন হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কেউ অসুস্থ হলে তাকে বিমারখানায় সরিয়ে নেয়া হতো। গুরুত্বপূর্ণ কোন মহিলা ইন্তেকাল করলে মর্যাদা অনুযায়ী তার জন্য শোক প্রকাশ করা হতো। যদি কেউ সন্তানহীন থাকতো, তাকে রাজপরিবারের কোন সন্তানকে দত্তক নেয়ার অধিকার দেওয়া হতো।[৩৯] হুমায়ুনের জন্মের পরে বাবরের অন্যতম বেগম মাহম বেগমের ৪টি সন্তান মারা গেলে তিনি তার সতীনের সন্তান হিন্দাল ও গুলবদনকে দত্তক নিয়ে লালন পালন করেন। আকবরের প্রথমা স্ত্রী রোকেয়া সুলতান বেগম ছিলেন সন্তানহীনা। তাকে শাহজাদা সেলিমের পুত্র খুররমকে লালন পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাকে লালন পালন করেছিলেন।

সাধারণভাবে সম্রাটের মাতাই হতেন হারেমের প্রধানকর্ত্রী। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে তাদের বেগমগণ যথাক্রমে নূরজাহান এবং মমতাজ মহল সেই

দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৪০] বাবর হতে শুরু করে সকল মোগল সম্রাটগণই তাদের মাতাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করতেন। যেকোন উৎসবে রাজমাতারা সবচেয়ে আগে অভিবাদন পেতেন। সম্রাটগণ বাহির হতে হারেমে এসে আগে তাজিমের সাথে মায়ের সাথে দেখা করতেন। আপন মাতা, পালক মাতা ছাড়াও পিতার অন্যান্য স্ত্রীগণ মোগল সম্রাটদের নিকট থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতেন। অনেক সময় আপন মাতার চেয়ে সৎমাতা অনেক বেশি মর্যাদা পেতেন।[৪১] সম্রাট জাহাঙ্গীরের আপন মাতা ছিলেন যোধবাই। কিন্তু সম্রাট তার অন্য দুই সৎমাতা রোকেয়া সুলতান বেগম এবং সেলিম সুলতান বেগমকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সম্রাটের দুঃসময়ে এসব মহিলা তার পাশে থেকে অনেক সময় তাকে সাহস যোগাতেন।

মোগল হারেমের গুরুত্বপূর্ণ মহিলাগণকে রাজকীয় সম্মানসূচক খেতাব দেওয়া হয়েছিল। উপযুক্ত মহিলাদের সম্রাট নিজেই নির্বাচন করে উপাধী দিতেন এবং বরণ করে নিতেন।[৪২] সম্রাটদের মাতা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারীনি ছিলেন। সম্রাট আকবরের মাতা হামিদা বানু বেগমের উপাধী ছিল 'মরিয়ম মাকানী' যার অর্থ উভয় জগতের কুমারী।[৪৩] জাহাঙ্গীরের মাতা যোধবাঈয়ের উপাধী ছিল 'মরিয়ম-উজ-জামান' যার অর্থ বিশ্বজগতের কুমারী।[৪৪] শাহজাহানের মাতা জগত গোসাইয়ের উপাধী ছিল 'বিলকিস মাকানী' যার অর্থ পবিত্র বাসস্থানের মহিলা।[৪৫] মোগল সম্রাটগণ মাতাকে ছাড়াও প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহের কন্যা ও বোনদেরকে এ ধরনের উপাধী দিয়েছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার প্রথম স্ত্রী মানবাঈকে জৈষ্ঠ্য পুত্র খসরুর জন্মের পর 'শাহবেগম' উপাধী দিয়েছিলেন।[৪৬] জাহাঙ্গীর মেহের উন নিসাকে প্রথমে 'নূরমহল' যার অর্থ রাজপ্রাসাদের আলো, সিংহাসন লাভের পর 'নূরজাহান' যার অর্থ জগতের আলো উপাধীতে ভূষিত করেন।[৪৭] নূরজাহান পরে 'বাদশা বেগম' উপাধীও লাভ করেছিলেন।[৪৮] সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী আরজুমান্দ বানু 'মমতাজমহল' নামে পরিচিতি ছিলেন। মৃত্যুর পরে তাকে 'মালিক-ই-জাহান' উপাধী দেয়া হয়েছিল।[৪৯] শাহাজাহানের প্রিয় কন্যা জাহান আরা বেগম 'বেগম সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তারা উপাধী ছিল 'নবাব উলা'। পরে তাকে সবচেয়ে সম্মানজনক উপাধী 'বাদশা বেগম' প্রদান করা হয়।[৫০] মৃত্যুর পর তাকে 'সাহিবাত-উজ-জামানী' উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় কন্যা জিনাত-উন-নিসাকেও 'বাদশা বেগম' উপাধী দেওয়া হয়েছিল।[৫১]

হারেমে পালক মাতাগণ

মোগল হারেমে পালক মাতা বা ধাত্রীরাও বসবাস করতেন। রাজনৈতিক সংকট ও অভিজাত তুর্কি রীতি অনুযায়ী সন্তানের জন্মের পর ৭/৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত মোগল শিশুরা ধাত্রীর কাছে লালিত পালিত হতেন।[৫২] যে সব মহিলা মোগল শিশুদের পরিচর্যা ও দুধপান করাতেন তাদেরকে হারেমে উচ্চপদ ও সম্মান দেয়া হত। তারা আনগা

নামে পরিচিত ছিল। হামিদা বানুর গর্ভে আকবর যখন জন্মগ্রহণ করেন, হুমায়ন তখন ছিলেন মুকুটবিহীন সম্রাট। বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে আকবর ধাত্রীদের নিকট লালিত পালিত হন। এ সময় শিশুপুত্র আকবরকে বেশ কয়েকজন ধাত্রী বা পালক মাতা দেখাশুনা করতেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হুমায়নের দুর্দিনে নিত্যসহচর শামসুদ্দিন মোহাম্মদের স্ত্রী জিজি আনগা, নাদিম কোকার স্ত্রী মাহম আনগা, তুগবেগের স্ত্রী কুকি আনগা, শাদাত ইয়ার কোকার মাতা পিজিজান আনগা, দিলদার আনগা, বিবি রুপা, ভাওয়াল আনগা প্রভৃতি অন্যতম।[৫৩] এদের মধ্যে মাহম আনগা ছিলেন প্রধান ধাত্রী।

১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন বৈমাত্রেয় ভাই কামরানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এ সময় কাবুল কামরানের দখলে ছিল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কামরান ভ্রাতুস্পুত্র আকবরকে হত্যার হুমকি দিলে মাহম আনগা শিশুপুত্র আকবরকে বুকে জড়িয়ে তাকে রক্ষা করেন।[৫৪] আকবর ধাত্রীদের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মাহম আনগা ও জিজি আনগাকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। সম্রাট আকবরের শাসনামলে মাহম আনগা পালকমাতা হিসেবে অনেক রাজনৈতিক ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন।[৫৫] সম্রাট জাহাঙ্গীরের পালকমাতা ছিলেন কুতুব উদ্দিন খান কোকার মাতা। তার মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর তার কাঁধের উপর পালকমাতার পদদ্বয় রেখেছিলেন এবং শবদেহ সমাধি পর্যন্ত তিনি বহন করেছিলেন।[৫৬] তার মৃত্যুতে তিনি চরম দুঃখ অনুশোচনা করেছিলেন।

হারেমে মহীয়সীদের জীবন পদ্ধতি ও ধর্মচর্চা

হারেমের মহিলাদের কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হতো। মহিলাদের পছন্দমত হারেমের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তারা বাহিরে গেলে তাদের মুখ ভাল করে ঢাকা থাকত। হারেমের মধ্যে তারা ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারতেন।[৫৭] হারেমের দৈনন্দিন জীবন ফূর্তিও আমোদ প্রমোদে পূর্ণ ছিল। মহিলারা জাঁকজমকপূর্ণ ও সুসজ্জিত বাসস্থানে বসবাস করতেন। কারুকার্য খচিত দামী ও সুন্দর পোশাক তারা পরিধান করতেন। তারা নিজেদেকে স্বর্ণালংকারে সজ্জিত করতেন। তারা খুব কমই বাহিরে যেতেন। অভিজাত মহিলাগণ অধিকাংশ সময় হাতীর পিঠে সুসজ্জিত হাওদায় কিংবা পালকিতে আরামে ভ্রমণ করতেন।[৫৮] হারেমের অধিবাসীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন রাজকীয় বিভাগ হতে ব্যাপক আকারে পূরণ করা হতো। মহিলাদের সুন্দর সুন্দর পোশাক, স্বর্ণালংকার, পরিবারের জিনিস পত্র সবই রাজকীয় কারখানা হতে সরবরাহ করা হতো। প্রত্যেকের সেবার জন্য দাসী ছিল। জীবন যাপনের সকল উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা সেখানে ছিল। বাহিরে বের হওয়ার তেমন প্রয়োজনই ছিল না।[৫৯]

হারেমের অনেক মহীয়সী ধর্মপরায়ন ছিলেন। তারা ইসলামের অনুশাসনগুলি যথাযথভাবে পালন করতেন। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে পরিবারের প্রথম শিক্ষার পাঠ শুরু হতো। পবিত্র কুরআন শিক্ষা করার পর তাঁরা ভাষা, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুলবদন বেগম মোগল মহীয়সীদের নিয়ে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেলিমা সুলতান বেগম, সুলতানুম বেগম, আসকারী মীর্জা, হাজী বেগম, গুলজার বেগম প্রমুখ নারীরা এই হজ্বযাত্রায় অংশগ্রণ করেন।[৬০] হজ্বযাত্রী বহণকারী জাহাজটি পথিমধ্যে দস্যু কবলিত হয়। দস্যু মুক্ত হওয়ার পর গুলবদন বেগম স্বদেশে না ফিরে তিন বছর মক্কায় অবস্থান করে চারবার হজ্বব্রত পালন করেছিলেন। জাহান আরা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নামাজ এবং কুরআন পাঠ করতেন। তিনি সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথমে চিশ্তীয়া তরীকাপন্থী পরবর্তীকালে ভাই দারাশিকোর প্রভাবে কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী হন। জেব উন নিসাও ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন হিফ্জ করেন। জেব উন নিসা কুরআনের অনুবাদ ও তফসির রচনা করতেন।[৬১] তিনি সুফীমতবাদে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং ধার্মিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ধর্ম সংক্রান্ত জটিল আলোচনায় জেব উন নিসা অংশ গ্রহণ করতেন। ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা চলাকালে সুন্নীদের পক্ষ অবলম্বনের জন্য তিনি শরিয়ত সম্মতভাবে দরবারে উপস্থিত হতেন। তিনি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করতেন।[৬২] আওরঙ্গজেব তার দ্বিতীয় কন্যা জিনাত-উন-নিসাকেও ধর্ম সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তৃতীয় কন্যা বদরুন নিসাও কুরআনে হাফেজ ছিলেন। এ সব মহীয়সীদের ধর্মচর্চা মোগল হারেমে এক নতুন আবহ সৃষ্টি করেছিল।

হারেমে রান্না-বান্না ও খাবার পরিবেশন

হারেমের মহীয়সীদের প্রতিদিনের খাবার সরবরাহের জন্য সুন্দর রাজকীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল। মাতবাখ, আকবার খানা, মেওয়াখানা, রিকাবখানা ও কারখানা প্রভৃতি বিভাগ ছিল উল্লেখ্যযোগ্য।[৬৩] সম্রাটসহ পুরো পরিবারের খাবার রাজকীয় রান্নাঘর 'মাতবাখ' থেকে সরবরাহ করা হতো। রান্নাঘরের যিনি প্রধান ছিলেন তাকে মীর বাকাওয়াল বলা হতো। রান্নার পর বাকওয়াল খাবার পরীক্ষা করে তা বিশেষ পাত্রে সীল মেরে হারেমে সরবরাহ করতেন।[৬৪] খাবার পানি এবং পানি জাতীয় খাবার 'আকবরখানা' থেকে সরবরাহ করতেন। গ্রীষ্মকালে বরফ ঠান্ডা পানিও তারা সরবরাহ করত। বিভিন্ন ধরনের ফলমূল 'মেওয়াখানা' হতে দেওয়া হতো। 'রিকাবখানা' হতে রুটি ও অন্যান্য শুকনো জাতীয় খাবার সরবরাহ করা হতো। হারেমের মহিলারা প্রতিদিন সকালে খাবার গ্রহণ করত এবং তা রাত্রি পর্যন্ত চলতো।[৬৫] রাজকীয় রান্নাঘরে দেশী, বিদেশী বাবুর্চি নিয়োগ করা হতো। তারা অনেক সুস্বাদু ও রকমারী খাবার তৈরী করতেন। হারেমের মহিলারা সুপারী ও মসলা দিয়ে পান খেতেন। অতিথিকে তারা খাবার হিসেবে পানও উপহার দিতেন।[৬৬]

হারেমে বিনোদন ও অবসর সময়

হারেমের মহিলাগণ খুব কমই রাজপ্রাসাদের বাহিরে যেতেন। তাঁদের অধিকাংশ সময় অন্দরমহলের মধ্যে কাটতো। হারেমের কর্মচারীরা তাঁদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতেন। রাজকীয় মহিলাগণ নিজেদেরকে অলংকৃত, সুসজ্জিত ও সুন্দরী করতে অনেক সময় ব্যয় করতেন। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্য হারেমের মধ্যে বিনোদনের বিভিন্ন আয়োজন হতো। সংগীত ও নাচের জন্য মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা ছিল। তারা নাচ গানের অনুষ্ঠান করতো। হারেমের মহিলাগণ পর্দার আড়াল থেকে এ সব অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন।

হারেমে মহিলাগণ আভ্যন্তরীণ খেলা খেলতেন। দাবা ছিল তাদের জনপ্রিয় খেলা।[৬৭] এই খেলা কখন শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। মুসলিম চিন্তাবীদগণ এই খেলাকে বৈধ বলে মনে করেন। যেহেতু এই খেলা ভাগ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো না বরং দক্ষতার উপর নির্ভর করতো। মোগল হারেমের মহিলাগণ জনপ্রিয় আভ্যন্তরীন খেলা হিসেবে দাবা খেলতেন। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী আরামজান বেগম একজন সুপরিচিত দাবা খেলোয়াড় ছিলেন।

চৌপার মোগলদের অন্য একটি আভ্যন্তরীন জনপ্রিয় খেলা ছিল।[৬৮] পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই খেলায় আগ্রহী ছিলেন। এই খেলা প্রাচীনকাল হতে আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল। রাজকীয় এবং আভিজাত পরিবারে চৌপার জনপ্রিয় খেলা হিসেবে বিবেচিত হতো। চৌপার কাপড়ের তৈরী একটি বোর্ডের উপর খেলত যা ক্রোস আকৃতির। তিনটি ভিন্ন নামে কিছু পার্থক্যসহ একই বোর্ডে এই ধরনের খেলা খেলত। খেলাগুলি ছিল চৌসার, চৌপার ও পাচিসি।[৬৯] মোগল মহিলাদের মধ্যে জেব উন নিসা চৌপার খেলা খুব পছন্দ করতেন।[৭০]

পাচিসি মোগল মহিলাদের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ছিল। পাচিসি বোর্ড চারটি ত্রিভুজের জায়গা নিয়ে কেন্দ্রে একটি চৌকা গঠিত হত। প্রতি চৌকা ২৪ টি ছোট চৌকায় বিভক্ত ছিল। তিনটি সারি গঠিত হত এবং প্রতি সারিতে আটটি চৌকা থাকত। প্রত্যেক খেলোয়াড় বিশেষ রংয়ের হাতীর দাঁত বা কাঠের শঙ্কর ছাগবাছাগীর দ্বারা এই খেলা খেলত।[৭১] সচরাচর চার ব্যক্তি এই খেলা খেলতেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেক চতুর্ভূজের বিপরীতে বসতেন। সুন্দরভাবে সেলাইকৃত ও অলংকৃত পাচিসি বোর্ডটি ব্যবহার করতে পারতেন। প্রত্যেকেই দুটি বিপরীত চতুর্ভূজ আটটি টুকরাসহ নিতেন। পরবর্তী চতুর্ভূজ হতে সবগুলিতে তারা খেলতেন। মোগল আমলে পাচিসি খেলার জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। আগ্রা দূর্গেও এই খেলার প্রচলন ছিল।

হারেমের মহীয়সীগণ চৌগান বা পলো খেলা খেলতেন। তাদের নিকট পলো ছিল খুবই জনপ্রিয় খেলা। মোগল চিত্রকলায় মহিলাদের পলো খেলায় দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কর্মক্ষম ও যুবতী মহিলাগণ এই খেলা খেলত। পলো বা চৌগান খেলার জন্য বড় মাঠের প্রয়োজন হতো। আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির দূর্গে পলো খেলার ব্যবস্থা ছিল।[৭২] ফতেপুর সিক্রিতে এখনও এই মাঠের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পলো বা চৌগান খেলায় দশজন খেলোয়ার খেলত। পাঁচজন করে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে বিশেষ বাঁকানো ছড়ির সাহায্যে তারা এই খেলা খেলতেন। সম্রাট আকবর নিজেও এই খেলা খেলতেন।[৭৩] এই খেলার মাধ্যমে মোগল মহীয়সী নারীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হতো। পরবর্তীতে পলো খেলার আদলে হকি, গলফ ও ক্রিকেট খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও হারেমের মহীয়সীরা লুকোচুরি খেলার মাধ্যমে হারেমে অবসর সময় কাটাতেন।

হারেমের মহীয়সী নারীগণ সম্রাটদের সাথে শিকারে বের হতেন। তাদের অনেকেই অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী ছিলেন। তাদের মধ্যে নূরজাহান বেগম, জেব উন নিসা ও শাহজাহানের নাতনী আয়েশা বানু বেগম অন্যতম।[৭৪] তারা তীর, ধনুক ও বন্দুক ব্যবহার করতে পারতেন। নূরজাহান খুব ভাল শিকার করতে পারতেন। একবার তিনি স্বামী জাহাঙ্গীরের সঙ্গে শিকারে গিয়ে ছয়টি গুলিতে চারটি বাঘ শিকার করেন। এতে সম্রাট খুশি হয়ে তাকে এক হাজার আশরাফী মুদ্রা দিয়েছিলেন।[৭৫] নূরজাহানের বাঘ শিকার ও অন্যান্য পাখী শিকারের এরূপ আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। শিকার ও বন্দুক চালনায় নূরজাহান নিঃসন্দেহে পুরুষের চাইতে অধিক পারদর্শী ছিলেন।

মোগল হারেমের অনেক মহীয়সী অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন বা চিত্রকলার চর্চা করতেন। মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় হারেমে চিত্রকলা চর্চার বিশেষ পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। হারেমে সম্রাট হুমায়নের শাসনামলে চিত্রকলা চর্চার সুচনা হয় এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে তা উৎকর্ষতা লাভ করে। মোগল চিত্রকলায় পারস্য ও ভারতীয় হিন্দু রাজপুত প্রভাব লক্ষণীয়। সম্রাট হুমায়ন সর্বপ্রথম পারস্য হতে খাজা আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজি নামে দুইজন চিত্রশিল্পীকে আনেন।[৭৬] তাদের মাধ্যমেই হারেমে চিত্রকলা চর্চার সূচনা হয়। সম্রাট আকবরের শাসনামলে রাজপুত্র নারীরা মোগল হারেমে বউ হয়ে আসেন। তাদের আগমন হারেমের চিত্রকলা চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। আকবরের সময় হারেমে হিন্দু-মুসলিম মহীয়সীদের চিত্রকলা চর্চায় এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। আকবরের মিনেয়েচার চিত্রশিল্পে এ সময় সবচেয়ে বেশী হারেমের আভ্যন্তরীন চিত্রশিল্প লক্ষ্য করা যায়।[৭৭] মোগল চিত্রকলায় ইউরোপীয় প্রভাবও লক্ষণীয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মোগল চিত্রকলার ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। মোগল হারেমে নূরজাহানের আগমন মোগল চিত্রকলায় নতুন মাত্রা যোগ করে। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় হারেমে চিত্রকলা চর্চায় ভারতীয়, পারসীক ও ইউরোপীয় রীতির অপূর্ব সংযোজন দেখা যায়।[৭৮] এ সময় উল্লেখযোগ্য নারী চিত্রশিল্পী ছিলেন নাদিয়া বানু, শাদিয়া বানু, রোকেয়া বানু, নিনি সহ প্রমুখ।

হারেমে মহীয়সীদের পোশাক পরিচ্ছদ, রূপচর্চা ও সাজসজ্জা

হারেমের মহিলাগণ সুন্দর-সুরুচি সম্পন্ন, পরিশীলিত পোশাক পরতেন। হারেমের মহিলাদের রেশমী, মসলিন কাপড়ের প্রতি আগ্রহ ছিল। তাদের পোশাক পরিচ্ছদে তুর্কি, পারসিক, রাজপুত্র হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তারা যে সব কাপড়ের পোষক পরতো তার বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন-কিংখাব, জাররাফত, তিলাদোজ, মুক্কেশর, কালাবর্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৭৯] বাবরের বড় বোন খানজাদা বেগম তুর্কি পোষাক পড়তেন। বাবর ও হুমায়নের সময় মোগল হারেমের মহিলারা তুর্কি, পারসিক ও খোরাসানী পোষাক পরতেন। ফুলতলা রেশমী পেশোয়াজ চোলির উপর পাতলা ওড়না তারা ব্যবহার করতেন।[৮০] এ সময় তাদের জনপ্রিয় পোশাক ছিল- পোস্তান, বানিচ, উলবাগ ও তারহাত প্রভৃতি। সম্রাট আকবরের সময় হারেমের রাজপুত হিন্দু মহিলারা শাড়ী, লেহাঙ্গা, আঙ্গিয়া ও ওড়না ব্যবহার করতেন। এ সময় পোশাক পরিচ্ছদ ও কেশ বিন্যাসের ক্ষেত্রে হিন্দু রীতি নীতি লক্ষ্য করা যায়।

হারেমের মহিয়সীগণ রূপচর্চা ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতেন। তারা সুন্দর করে সাজতেন, হাত পায়ে মেহেদী ও সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করতেন। রুপচর্চায় কর্পূর, চন্দন, গোলাপজল ও মুশক ব্যবহার করতেন।[৮১] চোখে কাজল, ও সুরমা লাগাতেন। হিন্দু বিবাহিত নারীরা টিপ ও সিঁদুর ব্যবহার করতেন। দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং সম্রাটের নিকট আকর্ষণীয় করে ধরে রাখতে তারা রুপচর্চায় গুরুত্ব দিতেন। তারা সুগন্ধী ও ব্যবহার করতেন।

সাজসজ্জার ব্যাপারেও তারা বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নিত্যনতুন ডিজাইনের পোশাক ও অলংকার তারা পরতেন। তারা হীরা, মনিমুক্তা খচিত অলংকার ব্যবহার করতেন। তাদের অলংকারের মধ্যে জনপ্রিয় অলংকার ছিল- শীষফুল, কোট বিলদার, সেকরা, কারানফুল, চম্পাকলী, নাথ, হার, কাংগান, আংটি প্রভৃতি। গৃহসজ্জার প্রতিও তারা আগ্রহী ছিলেন। তারা উন্নতমানের চন্দন কাঠের কার্পেট ব্যবহার করতেন।[৮২] যার নাম ছিল 'ফারাশ-ই-সান্দালী'। খাদ্য পরিবেশনের জন্য দস্তরখানা বিছানোর নিয়ম নূরজাহান হারেমে প্রথম প্রচলন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, হারেমের অভ্যন্তরে মোগল নারীরা অত্যন্ত শৃংখলাপূর্ণ ও বিলাস ব্যাসন জীবন যাপন করতেন। তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন, কার্যাবলী সবই ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা, ভাল-মন্দ সব কিছুই হারেমের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো। ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান সুতিকাগার ছিল হারেম। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার অন্যতম নজীরও এ হারেমেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের জীবনের নানা কল্পকাহিনী বাহিরে রং মিশিয়ে রুপকথার গল্পের মত বাহিরে ছড়িয়ে পড়ত। যার সাথে বাস্তবতার কোন মিলই ছিল না।

তথ্যপঞ্জী :
১. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 135.
২. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা*, পৃ.৭।
৩. *তদেব*, পৃ. ৬।
৪. গুলবদন বেগম,*হুমায়ুননামা*,পৃ.৭।
৫. *তদেব*, পৃ. ৭।
৬. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম*, (ঢাকা: *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩১ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৪), পৃ. ১৮-১৯।
৭. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম সমাজে মহীয়সী নারী*, পৃ, ৬৬।
৮. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.20.
৯. কেউ কেউ মনে করেন অমর কেটের মরুপ্রান্তরে আকবর জন্মলাভ করেন।
১০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* পৃ.১২।
১১. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* পৃ.৫৬।
১২. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা* পৃ, ১৫৮।.
১৩. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.20
১৪ . Abul Fazl, *Akbar Nama* (tr.) Vol, 11, pp.242-43.
১৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১২।
১৬. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution*, p. 22.
১৭. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.27.
১৮. *তদেব*, পৃ. ২৭।
১৯. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution*, p. 26.
২০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৬।
২১. *তদেব*, পৃ. ৬৭-৬৮।
২২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৭৩।
২৩. Rekha Misra, *Women In Mughal India*, pp.41-42.
২৪. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ৯৪-৯৬।
২৫. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution*, p. 23.
২৬. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, পৃ. ১০৫।
২৭. Rekha Misra, *Women in Mughal India*, pp. 53-54.
২৮. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, পৃ. ১০৫।
২৯. মাহমুদ শামসুল হক, *মুঘল হারেম- অন্দরের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩৭৬।
৩০. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১১।
৩১. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, পৃ. ৯৮।
৩২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৮৮।
৩৩. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contribution*, pp. 23-24.
৩৪. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p.29.
৩৫. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা*, পৃ. ১৭৬
৩৬. Nur-ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri*, (tr.) Vol. 1, p.20.
৩৭. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 30

৩৮. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their contribution*, p.18.
৩৯. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম সমাজের মহীয়সী নারী*, পৃ. ৬৬।
৪০. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their contribution*, p. 18.
৪১. K.S Lal, *The Mughal Harem*, pp.23-24.
৪২. Niccolo Mannucci, *Storia Do Mogar*, vol. II, p. 315
৪৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১২।
৪৪. Nur-ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i- Jahangiri* (tr.) vol.I, p.76.
৪৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১২।
৪৬. Nur-ud-in Muhammad Jahangir,*Tuzuk-i- Jahangiri* (tr.) vol.I, p.55.
৪৭. *Ibid*, p. 319
৪৮. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 71
৪৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১২; Rekha Misra, *Woman in Mughal India*, p. 60.
৫০. Niccolo Mannucci, *Storia Do Mogar*, vol. II, p. 127.
৫১. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১২।
৫২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৫৬।
৫৩. Abul Fazl, *Akbar Nama*, vol. III, pp.109-10, 130-131.
৫৪. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৫৬।
৫৫. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, p. 19.
৫৬. Nur-ud-in Muhammad Jahangir,*Tuzuk-i- Jahangiri* (tr.) vol.I, pp. 84-85.
৫৭. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And Their Contrubution*, p.16
৫৮. *Ibid*, p.16.
৫৯. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডচিত্র*, পৃ. ৪০।
৬০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৪৯।
৬১. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী* পৃ. ১১৩।
৬২. তদেব, পৃ. ১১৬-১১৭।
৬৩. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, পৃ. ৪০।
৬৪. Abul Fazl, *Ain-i-Akbori*, vol. I, pp. 54-61.
৬৫. *Ibid*, p. 59.
৬৬. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*,p. 17
৬৭. *Ibid*, p.17.
৬৮. *Ibid*, P.93.
৬৯. *Ibid*, P.94.
৭০. Rekha Misra, *Women in Mughal India*, p.85-86.
৭১. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, p.94.
৭২. *Ibid*, p. 99.
৭৩. Abul Fazl, *Akbar Nama*, vol. I, pp.309-310.
৭৪. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*,p. 98
৭৫. Nur-ud-in Muhammad Jahangir,*Tuzuk-i- Jahangiri (tr.)* vol. I, p. 375.

৭৬. Najma Khan Majlis, Woman Painters During the times of Emperor Jahangir (1605-1627 A.D), *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXXI, No. 2 Dec. 1986. p. 51.

৭৭. *Ibid*, p. 52.

৭৮. হাসান শারীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, পৃ. ৪১.

৭৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ২৬।

৮০. *তদেব*, পৃ. ২৭-২৮।

৮১. নুসরাত ফাতেমা, মোঘল হারেমে শিক্ষা-সংস্কৃতিঃ চর্চার ধারা (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ) *প্রবন্ধ সংকলন* (ঢাকা বিশ্বদ্যালয়,ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,২০০৮), পৃ.৬৯।

৮২. *তদেব*, পৃ. ৬৯।

চতুর্থ অধ্যায়
হারেমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার চর্চা

ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ইতিহাসে মোগল শাসনকাল গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শিক্ষানুরাগী মোগল শাসকগণ যেমন উদার মনোভাবাপন্ন ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন,[১] তেমনি এই রাজ পরিবারভুক্ত নারীরা হারেমে অবস্থান করেই শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[২] প্রজাপালন ও জনকল্যাণমূখী শাসন প্রবর্তন করে মোগল সম্রাটগণ জনগণের আস্থা অর্জন করেন। মোগলরা কন্যা-পুত্র নির্বিশেষে পরিবারভুক্ত সকল শিশুর সমান শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। মেয়ে শিশু হলেও তাদের লালন পালন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য করেননি।[৩] শিক্ষার সুযোগসহ নারীদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। কারণ ইসলামই নারীকে তার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে। নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন ও মানসিক চিন্তার পার্থক্যের কারণে এদের কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও ইসলাম নারীকে তাঁর পাপ্য অধিকার দিয়েছে।[৪] যুগে যুগে নারীরা শিক্ষা আর পরিবেশের সুযোগে মানব সভ্যতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মোগল আমলেও সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজমহিষী, শাহজাদী এবং অনেক মহীয়সী নারী, শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মোগল আমলে জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ও চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে হারেমের ভূমিকাও ছিল অনস্বীকার্য।

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় উৎকর্ষ সাধনে হারেমের মহীয়সীগণ

মোগল রাজ-পরিবারের মহিলারা অফুরন্ত বিত্ত বৈভবের মধ্যে বসবাস করেও শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু মন ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে মোগল হারেমের নারীদের অবাধ বিচরণ ছিল। তারা ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভূগোল, অংক, ভাষা, কাব্যচর্চা, লিখনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা করতেন। অনেকে আবার নৃত্যচর্চা, সংগীত, চিত্রকলা ও রাজনীতি নিয়েও ব্যস্ত থাকতেন। হারেমের মহীয়সীদের অনেকেই তুর্কি ও ফার্সী ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন।[৫] হারেমে নারীদের মধ্যে যারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তারা হলেন গুলবদন বেগম, সেলিমা সুলতান বেগম, নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহানআরা, জেবউননিসা প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬] হারেমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রে এসব মহীয়সীই পথিকৃৎ ছিলেন। মোগল সম্রাটগণ শাসনকার্য পরিচালনার পাশাপাশি নারীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা চর্চার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন রাজমহিষী ও শাহজাদীদের অবদানে

মোগল সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষে মোগলদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে প্রতিভাময়ী মোগল নারীদের অবদান স্মরনীয় হয়ে আছে।

মোগল শাহজাদীদের শৈশবকাল হতেই শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। তাদের যথার্থ মর্যাদা প্রদান ও অধিকারের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাদের শিক্ষার জন্য পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশ হতে শিক্ষয়িত্রী আনা হতো। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে উন্নত মানসিকতায় গড়ে তোলা হতো। মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে কোনরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করা হতো না। হারেমে নারীরা পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ভাষা, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান চর্চা করতেন। কাব্য, সংগীত ও শিল্পকলার অনেক ক্ষেত্রেই মোগল নারীদের অবস্থান কম নয়। তাদের রচিত কাব্যগ্রন্থ ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছে। তাদের সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম বার্ষিক উৎসব নওরোজে প্রদর্শিত হতো এবং প্রশংসিত হতো।

গুলবদন বেগম

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের সুযোগ্য কন্যা ছিলেন গুলবদন বেগম। দিলদার বেগম গুলবদনের ভাগ্যবতী মাতা। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে গুলবদন জন্মগ্রহণ করেন। বাবর পানিপথের যুদ্ধ যাত্রাকালে গুলবদনের বয়স ছিল মাত্র ২ বছর। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবরের ভারত বিজয়ের পর সৎমা মাহম বেগম গুলবদনের শিক্ষাদীক্ষা ও লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। দিলদার অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাতে গুলবদনের লালন পালনের ভার তুলে দেন। কারণ মাহম বেগমই বাবরের হারেমের তখন প্রধান কর্ত্রী। গোটা রাজপরিবারের উপর তার ছিল ভীষণ আধিপত্য।[৭] মাহম বেগম নিঃসন্তানা ছিলেন না। নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ন তারই স্বনামধন্য পুত্র ছিলেন। পূর্বে মাহম বেগমের চার চারটি সন্তান মারা যাওয়ায় তিনি সন্তান হারানোর শোক ভুলবার জন্য দিলদার বেগমের চার সন্তান গুলবদন, গুলরং, গুলচেহারা ও হিন্দালের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন।[৮] তারা সকলেই আপন মায়ের আদরেই তার কাছে বড় হয়েছিলেন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী জয় করেন। এ সময় বাবর তার আপন পরিবার-পরিজন, বেগম, শাহজাদা ও শাহজাদীদের আগ্রায় নিয়ে আসেন। শাহজাদী গুলবদনের বয়স তখন মাত্র ৪ বছর। শাহজাদী শৈশব হতেই প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রখর স্মৃতিধর শাহজাদী দীর্ঘ ২ বছর পর স্বীয় পিতাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেন এবং তাকে কদমবুচি করেন।[৯]

সম্রাট বাবর রাজপরিবারকে নিয়ে ফতেহপুর সিক্রিতে বসবাস করতে থাকেন। সেখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর পানির ঝর্ণাধারা বাবরের মনে নতুন

সাহিত্যরসের সৃষ্টি করে। এ প্রেরণা থেকেই বাবর আত্মজীবনী 'তুযক-ই-বাবুর' রচনার প্রয়াস পান। কন্যা গুলবদন বেগম বাবার অবিন্যস্ত লিখনিধারায় মুগ্ধ হন। বাবরের এ জ্ঞানচর্চা গুলবদনের শিশুমনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফতেহপুর সিক্রিতে বসবাসকালে গুলবদনের ডান হাত ভেঙ্গে যায়। তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হন এবং আগ্রায় ফিরে আসেন। গুলবদনের বয়স যখন ৮ বছর তখন বাবর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে মারা যান। গোটা রাজপরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। পিতার মৃত্যুতে গুলবদন খুবই ভেঙ্গে পড়েন এবং মর্মাহত হন। তখন মাহম বেগমই ছিলেন রাজপরিবারের প্রধান অভিভাবক। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস; এর ২ বছর পর মাহম বেগমও মারা যান। এতে গুলবদনের শোক আরো বেড়ে যায়।[১০] তখন হুমায়নই ছিল তার আশ্রয়স্থল। হুমায়ন প্রায়শই তাকে শান্তনা দিতেন। হুমায়ন গুলবদনকে এতই স্নেহ করতেন যে, হুমায়নের অসুস্থ অবস্থায় গুলবদনের উপস্থিতিতে তিনি সুস্থবোধ করতেন।[১১]

বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহন করেন। এ সময় গুলবদন বেগম পিতৃহারা হয়ে হুমায়নের তত্ত্বাবধানেই বড় হন। হুমায়ন ছোট বোন গুলবদনকে খুবই স্নেহ করতেন। হুমায়ন রাজ্য হারিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে যখন নানা দেশ ঘুরছিলেন, তখন গুলবদন বেগম তার সাথে ছিলেন। গুলবদন হুমায়নের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। যাযাবর জীবনেও হুমায়ন বোনের শিক্ষার ব্যাপারে যথাসম্ভব যত্নশীল ছিলেন। তার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য হুমায়ন পারস্য থেকে শিক্ষিকা নিয়ে আসেন। ফলে গুলবদনের জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়। গুলবদন ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারিনী। তার আর এক নাম ছিল সালেহা। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি হারেমে শিক্ষার আলো বর্তিকা প্রজ্বলিত করেন। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে পরবর্তী মোগল জানানাদের তিনি পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তী মোগল জানানা মহলে শিক্ষার আগ্রহ প্রসারিত হয়।[১২]

জ্ঞানচর্চার প্রতি গুলবদনের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। জ্ঞানচর্চায় তাঁর আগ্রহ দেখে হুমায়ন দেশ-বিদেশ থেকে অনেক দুর্লভ বই সংগ্রহ করে দেন। এতে জ্ঞান চর্চার প্রতি তার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। জ্ঞান চর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে তিনি একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন।[১৩] দেশ-বিদেশের অনেক মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে তিনি তা লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করতেন। তার হাতের লেখা ছিল খুবই চমৎকার। গুলবদন বেগম হারেমের ভিতর ছোট মেয়েদের শিক্ষার জন্য 'আতুননামা' নামে একটি স্কুল ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৪]

গুলবদন ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি ফার্সী ও তুর্কি ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। উভয় ভাষাতেই তিনি ব্যাপক বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্যচর্চা ও

ইতিহাস রচনা করে ভারতবর্ষে মোগল ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে আছেন। ফার্সী ভাষার কবি ফেরদৌসী ও হাফিজের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তার কাব্য প্রতিভায় ফার্সী প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষনীয়। কাব্যসাধানায় তিনি হাফিজ ও ফেরদৌসীকে অনুসরন করতেন। তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফার্সী কবিতা রয়েছে। তিনি তুর্কি ও আরবি ভাষাতেও সুপন্ডিত ছিলেন এবং এসব ভাষায় মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা করেছেন। "তাজকিরাতুল খাওয়াতি" গ্রন্থে মীর মেহদি সিরাজি গুলবদনের কয়েকটি ফার্সী কবিতার অনুবাদ করেছেন। ঐসব কবিতার একটি নিম্নরূপ:

নিজের প্রেমিকের প্রতি প্রত্যেক পরী বিমুখ;
নিশ্চয়ই জানিও জীবনরূপ ফল পূর্ণরূপে কেউ আস্বাদন করে না।[১৫]

গুলবদন ছিলেন একজন ইতিহাস সচেতন নারী। তার লেখা 'হুমায়ননামা' ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।[১৬] ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্রাট আকবরের নির্দেশে এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছাড়াও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বাবর, হুমায়ন ও আকবরের শাসনামলের নানা ঘটনাবলী, বিভিন্ন উৎসবাদী, দরবারের বর্ণনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। সমকালীন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের রীতিনীতিও এতে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্রাট আকবরের সময়ের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আকবরনামা' গ্রন্থ অনেকাংশে শাহজাদী গুলবদনের 'হুমায়ননামা'র নিকট দায়বদ্ধ।[১৭] বৃটিশ আমলে হ্যামিলটন নামে জনৈক্য এক ইংরেজ কর্মচারী গুলবদন বেগমের 'হুমায়ননামা' গ্রন্থখানি শাহী মহাফেজখানা থেকে লন্ডনে নিয়ে যান। তা এখনো বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। মিসেস বিভারিজ নামীয় এক ইংরেজ মহিলা তার এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক বইটি লন্ডনে প্রকাশিত হয়।[১৮] চৌধুরী মুহাম্মদ শামসুর রহমান এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে 'হুমায়নামা-ই-গুলবদন বেগম' শিরোনামে ফার্সী ভাষায় একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৯]

গুলবদন বেগম গ্রন্থখানিতে তাঁর কিশোর বয়স হতে মৃত্যু পর্যন্ত দেখা বিভিন্ন ঘটনাবলীর চাক্ষুশ বর্ণনা দিয়েছেন। উপমহাদেশের ৩শ বছর পূর্বের ঘটনাবলী এই বইখানিতে উঠে এসেছে। সে কালের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, বিভিন্ন শিল্পকর্মে পারদর্শিতা ও মেয়েদের প্রতি পুরুষদের সম্মান প্রদর্শন, মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন; যা ভারতের মোগল ইতিহাসে অন্যতম উৎস হিসেবে গন্যা করা যায়।[২০] 'তুযক-ই-জাহাঙ্গারী' ও 'রোকায়াতে আলগিরী' সেকালে সহজ ফার্সী ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করা হত। 'হুমায়ননামা' কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোকেই ছাড়িয়ে গেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২১]

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইউনুস খানের এক পৌত্র খজির খাজা খানের সংগে গুলবদন বেগমের শুভ বিবাহ হয়।[২২] কারো কারো মতে তিনি এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। অন্যমতে তার একাধিক সন্তান ছিল। তবে এদের কেহই খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন না। গুলবদন শেষ জীবনে সাহিত্য সাধনা, অধ্যয়ন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। শেষ জীবনে এবাদত বন্দেগী আর দান খয়রাত করে তিনি জনসেবা করে গেছেন। তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি ছিলেন একজন স্বামীভক্ত স্ত্রী, একজন স্নেহময়ী মা, এবং সম্রাট হুমায়নের সুখ দুঃখের একজন ভাগ্যবতী ও শুভাকাংখী বোন।[২৩] জীবনের শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে মারা যান। তার সম্পর্ক বলা যায়-Her charities were large and it said of her that she added day unto day in the endeavour to please god and this by succouring the poor and needy.[২৪]

গুলবদন বেগম খুবই সংবেদনশীল প্রকৃতির নারী ছিলেন। তার কবিতায় মানবতাবোধ লক্ষ্য করা যায়। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে বৈমাত্রেয় ভাই হিন্দাল অন্য ভাই কামরান মির্জাকে হত্যা করলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ফার্সী ভাষায় লেখেন-

'আয় দরেঘা, আয় দরেঘা, আয় দরেঘা !
আফতাবম্ শুদ নিহান দর জের-ই-মেঘ!'[২৫]
(হায়রে, হায়রে, হায়রে দুঃখ! সূর্য আমার ঢেকে গেল মেঘের আড়ালে।)

সেলিমা সুলতান বেগম

মোগল হারেমের আরো একজন মহীয়সী নারী সেলিমা সুলতান বেগম। তার বাবার নাম মির্জা নুর উদ্দিন মুহাম্মদ, মাতা গুলগাদার বেগম। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কাবুলে তার জন্ম হয়। সেলিমার মা গুলগাদার বেগম ছিলেন বাবরের তৃতীয় স্ত্রী গুলরুখ বেগমের জৈষ্ঠ্যা কন্যা। কামরান মির্জা ও আসকারী মির্জা তার সহোদর ভাই হলেও বৈমাত্রেয় ভাই হুমায়নের সংগেই গুলগাদারের সম্পর্ক বেশী ভাল ছিল। হুমায়ন রাজ্য হারা হলে সেলিমা তার মার সাথে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ সময় সেলিমা সুলতান খালা গুলবদনের সাহচার্য লাভ করেন এবং তার উৎসাহেই সাহিত্যে অনুরক্ত হয়েছিলেন।[২৬] তিনি ছিলেন মোগল বিদুষীদের মধ্যে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার অদম্য অধ্যয়নস্পৃহা ও কবিতা রচনার দক্ষতা ছিল। তিনি হুমায়নের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে যাতায়াত করতেন এবং প্রচুর দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠের সুযোগ লাভ করেন।[২৭] সেলিমা ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। তিনি উন্নত মানের ফার্সী কবি ছিলেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রাঞ্জলতা ও বিষয়বস্তু নিবার্চনে তার অসামান্য দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'মাখফি' (concealed) বা লুক্কায়িত ছদ্মনামে কবিতা রচনা করতেন।[২৮] সেলিমা সুলতান বেগমের কবিতার একটি অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

কাকুলৎ রা মনজে মস্তী রিযতা-ই জান গোফতা আম;
মস্তবুদম জী সবব হর্ফ-ই পরেশান গোফতা আম।[২৯]
(মোহাবশে তোমার চাঁচর কেশকে 'জীবন সূত্র' বলিয়াছি, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ।)

সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাদায়ুনি তার বিখ্যাত 'মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ' গ্রন্থে শাহজাদী সেলিমার ব্যাপারে অনেক মুল্যবান কথা বলেছেন। একজন উচ্চমানের পন্ডিত ও কবি বলে তিনি তাকে অভিহিত করেছেন। ফার্সী ভাষায় সেলিমার 'দিওয়ান' কাব্য সংকলন গ্রন্থটি একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ।[৩০] সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজবনী 'তুজক-ই-জাহাঙ্গীরীতে' সেলিমা বেগমের প্রকৃতি প্রদত্ত গুণ মানসিক উৎকর্ষ এবং সর্বোপরি তাঁর সুশিক্ষার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।[৩১] তাঁর কাব্য ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের এবং প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে হুমায়নের বিশ্বস্ত সহচর ও প্রধান সেনাপতি বৈরাম খানের সাথে সেলিমা সুলতানার বিয়ে হয়। হুমায়নের ইচ্ছা পুরণের জন্য আকবর বিয়ের এ ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়ের তিন মাসের মাথায় বৈরাম খান মারা যান। পরে সম্রাট আকবর তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন। আকবরের হারেমে সবচেয়ে বুদ্ধিমতি ও বাকপটুতায় অদ্বিতীয় বলে সেলিমার খ্যাতি ছিল। সেলিমা নিজ প্রতিভা বলে সম্রাট আকবরের স্ত্রীদের মধ্যে 'বাদশা বেগম' এর বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।[৩২] হুমায়ন ছাড়াও বৈরাম খান ও সম্রাট আকবরের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন।

সেলিমা বেগম জীবিত অবস্থাতেই তাঁর নিজ সমাধি নির্মাণ করেছিলেন আগ্রার নিকটবর্তী 'মান্দাকার বাগ' নামে এক বাগানে। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। সেলিমা সুলতান বেগমকে 'খাদিজা উজ-জামানী' উপাধি প্রদান করা হয়।[৩৩] সেলিমার পুর্বস্বামীর পুত্র আব্দুর রহিম খানের কন্যা জান বেগমও একজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন এবং সেলিমা বেগমের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের তাফসীর করেন। এজন্য সম্রাট আকবর খুশী হয়ে তাকে পঞ্চাশ হাজার দিনার উপহার দেন।

নূরজাহান

মোগল ইতিহাসের অবিস্মরনীয় ব্যতিক্রমধর্মী এক নারী। তার আসল নাম মেহেরেউন নিসা। তার পিতা মির্জা গিয়াস বেগ মোগল রাজদরবারের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহের উন-নিসাকে বিয়ে করে মোগল হারেমে তোলেন। জাহাঙ্গীর প্রথমে তাকে 'নূরমহল' বা প্রসাদের আলো এবং পরে 'নূরজাহান' বা পৃথিবীর আলো উপাধীতে ভুষিত করেন। বাংলার বর্ধমানের

জায়গীরদার আলী কুলি বেগের সংগে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে মেহের উন নিসার প্রথম বিয়ে হয়। আলী কুলি বেগ নিজ হাতে বাঘ মেরে শের আফগান উপাধি লাভ করেছিলেন। শের আফগান মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে দমন করার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীনকে পাঠানো হয়। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে শের আফগান তার সাথে সংঘর্ষে মারা যান। তাঁর গর্ভে লাডলী বেগম নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মেহের উন নিসা স্বামীহারা হয়ে স্বীয় পরিবারে ফিরে আসে।

নূরজাহান অসাধারণ রূপগুণ আর প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিনী ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা এবং শিল্পী হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বাল্যকালে পরিবারেই তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরবী এবং ফার্সী উভয় ভাষাতেই পারদর্শিতা অর্জন করেন। কবিতা আবৃত্তি ও ফার্সী কবিতা রচনাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার অনর্গল কবিতা আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।[৩৪] নূরজাহানও 'মাখফি' (concealed) বা লুক্কায়িত ছদ্মনামে ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা বরতেন। তিনি উপস্থিত যে কোন বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করতে পারতেন। তিনি ব্যাপক পড়াশুনা করতেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে আরবি ফার্সী এবং অন্যান্য ভাষায় দূর্লভ গ্রন্থ ছিল।[৩৫] সংগীত ও চিত্রকলার প্রতিও নূরজাহানের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। নিজে সংগীত রচনা করতেন। সুললিত কণ্ঠে গান গাইতে পারতেন। তার গান শুনে যে কেউ মুগ্ধ হয়ে যেত।

নূরজাহান ললিত-শিল্প কলাতে পরিদর্শী ছিলেন। তার হাতের ছোঁয়ায় ললিত-শিল্প কলার ক্ষেত্রে মোগল হারেম এক নতুন রূপ লাভ করে। নানা রুচির স্বর্ণালঙ্কার ও পোষাকে নূরজাহান অতুলনীয় সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আপাদলম্বিত নিচল ওড়নার ব্যবহার তিনিই প্রবর্তন করেন। ওড়নার পাঁচ তেলিয়া, কিনারি, বাদলা, আঙ্গিয়া বিশেষত দো-দমি পেশওয়াজ, পাঁচ তেলিয়া ওড়নার প্রচলন তিনিই করেন।[৩৬]

পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজ-গোজে নুরজাহান নতুন এক অভিনবত্ব নিয়ে আসেন। নববধুর ব্রকড ও লেস- দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী আকর্ষনীয় পোশাক তিনিই প্রথম চালু করেন। এবং এর নামকরণ করা হয় নূরমহলি। তিনি অলংকার পছন্দ করতেন। নানা রকমের অলংকারের প্রচলন ও বিশেষ করে তিনি মুক্তার অলংকারের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি ছবি আঁকতে পারতেন। নাচ ও সংগীতেও তার যথেষ্ট অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল।[৩৭]

নূরজাহানের রন্ধন নৈপুন্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সম্রাটকে খুশী ও তৃপ্ত করার জন্য নানা রকমের সু-স্বাদু ও মুখরোচক খাবার তৈরী করতেন। মাঝে মধ্যে তিনি শাহী ভোজেরও আয়োজন করতেন। সে যুগে কার্পেটের উপর যে দস্তরখানা

ব্যবহার করা হতো নূরজাহান দস্তরখানকে বিশেষ কারুকার্য করে তৈরী করে সাজিয়ে সৌন্দর্যানুরাগের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৩৮] তিনি চন্দনকাঠের উপর রং করে বিশেষ ভাবে কার্পেট তৈরী করেন। সম্রাট যার নাম দিয়েছিলেন 'ফরস-ই-সন্দলী'।

নূরজাহান ছিলেন উচ্চশিক্ষিত একজন নারী। আরবি ও ফার্সী ভাষাতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তার দাদা মুহাম্মদ শরীফ হিজরী, চাচা খাজাজি রাজী, চাচাত ভাই মীর্জা আহম্মদ সহ পরিবারের অনেকেই কবি ছিলেন।[৩৯] তাঁর পিতার ভাই মুহাম্মদ তাহের ওয়াছলীও সাহিত্য চর্চা করতেন। তার বোন খানিজা বেগমের স্বামী কাশেম খান ছিলেন মোগল দরবারের একজন দক্ষ সভা কবি। নূরজাহানের কবিতায় এক ধরনের আবেগ, প্রেম, আধ্যাতিকতা, সুখ-দুঃখ, হতাশা, রসিকতা প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই মহীয়সী মারা যান। লাহোরে স্বামী জাহাঙ্গীরের সমাধী পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়। সমাধী সৌধে তারই এক কবিতা স্মৃতি স্মরণ করে দেয়-

'বর্ মাজারে মা গরিবা নায় চেরাগে নায় গুলে
নায় পরে পরওয়ানা সুজদ নায় সদায়ে বুলবুলে।'[৪০]
('মোর গরীবের কবরের পর জ্বলে না চেরাগ, ফোটে না ফুল
পরোয়ানা পাখা পোড়ে না হেথায়, মর্সিয়া না গায় বুলবুল')

মমতাজ মহল

মমতাজ মহল মোগল হারেমের আরো একজন সৌন্দর্যশালিনী নারী। তার আসল নাম আরজুমান্দ বানু। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শাহজাহান তাকে বিয়ে করে মোগল হারেমে তোলেন। তখন থেকেই তিনি হয়ে উঠেন মমতাজ মহল বা মমতাজ ই-মহল (Chosen one of the palace)। তিনি ছিলেন রুপে গুণে এক অসাধারণ নারী। অত্যন্ত স্বামীভক্ত এই মহীয়সীকে শাহজাহান 'মালিক-ই-জামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী এই নারী আরবি ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং ফার্সীতে কবিতাও রচনা করতেন।[৪১] তিনি গুণী কবি ও লেখকদের সমাদর করতেন। বংশীধারা মিশ্র ছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ফার্সী ভাষায় অনুদিত এই কবির অনেকগুলো কবিতা পাঠ করে সম্রাজ্ঞী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার ব্যক্তিগত সহচরী সিত্তিউন নিসা বেগম ছিলেন একজন উচ্চাশিক্ষিতা পারস্য দেশীয় নারী। সম্রাজ্ঞীর হারেমে দাপ্তরিক সকল কাজ তিনিই পরিচালনা করতেন। সম্রাজ্ঞী তার তত্ত্বাবধানে জাহান আরা ও রওশন আরার শিক্ষারও সুব্যবস্থা করেন।[৪২] তিনি জ্ঞানী গুণিদের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন এই মহীয়সী প্রসব বেদনায় মারা যান।

জাহান আরা

মোগল সম্রাট শাহজাহানের জৈষ্ঠ্যা কন্যা জাহান আরা অসাধারণ রুপবতী গুণবতী নারী ছিলেন। মমতাজ মহলের গর্ভে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। এই মহীয়সী মোগল বংশের গৌরব। অতি ছোট বেলা থেকেই তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হয়। পারসিক পন্ডিত মহিলা সিত্তিউন নিসার তত্ত্বাবধানে শাহজাদী অতি অল্প বয়সেই কুরআন পড়তে শিখেন এবং ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।[৪৩] সিত্তিউন নিসার মত একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী পাওয়া ছিল জাহান আরার জন্য পরম সৌভাগ্য। তার প্রভাবেই জাহানারা পরবর্তী জীবনে উচ্চশিক্ষা অর্জনে আগ্রহী হয়েছিল। তার আরো একজন শিক্ষক ছিলেন তার নাম নজির। নজিরের নিকট জাহান আরা পারস্য সাহিত্য, পবিত্র কুরআনের তরজমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শিখেছিলেন।[৪৪] জাহান আরা তার পূর্বসুরী গুলবদন বেগম, সেলিমা সুলতানা ও নূরজাহানের মতই ফার্সী ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। তার রচিত ফার্সী কাব্য আজও ফার্সী সাহিত্যের অমুল্য সম্পদ। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদর করতেন। তার নিজস্ব তহবিল হতে অনেকের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করেছিলেন।[৪৫] তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সুফিতত্ত্বের উপর ব্যাপক পড়াশুনা করে গভীর জ্ঞান অর্জন ও করেছিলেন।

তিনি খাজা মঈন উদ্দিন চিশতিসহ সুফীগণের জীবনভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন যার একটির নাম 'মুনিস- উল আরওয়াহ' অপরটি 'রিসালা ই-সাহাবিয়া'। শাহজাদী গ্রন্থদ্বয়ের মূল উপাদান সংগ্রহ করেছেন বিখ্যাত সুফীধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ 'আখবার উল আখিয়ার' হতে। গ্রন্থদ্বয়ে ভাষার মাধুর্য সরলতা আর বিষয় উপস্থাপনায় জাহান আরার মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৬] প্রথম গ্রন্থে জাহান আরা আজমীর শরীফের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে সুফী সাধক মোল্লা শাহের জীবনী, কর্ম তার চিন্তা ও শিক্ষার আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থ দুটি ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। সমকালীন কবিদের কবিতা পড়তেন। হাজী মুহাম্মদ খান কুদুসীর কবিতা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকে পুরস্কার প্রদান করেন।[৪৭] তিনি ছিলেন চিরকুমারী, জ্ঞান সাধনা আর আধ্যাত্মিক সাধনায় এই মহীয়সী জীবন কেটে দেন। আগ্রা দুর্গের অন্দরমহলের 'দেওয়ান-ই- খাসের' পিছনে দেওয়াল গুলোর তাকে তার সাজানো বই থাকতো। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। সমকালীন কবি মুরিদ খান জাহান আরাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা করেন। সেখানে জাহান আরার সাহিত্যানুরাগের ধারণা পাওয়া যায়। ফার্সী ভাষায় রচিত তার কবিতা প্রবন্ধ ও জীবনভিত্তিক রচনাবলী আজও পারস্যদেশে এবং মুসলিম নারীদের নিকট সমাদৃত। এই মহীয়সী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিঃসঙ্গতা, শারীরিক অসুস্থ্যতা এবং বাবা-মার মৃত্যু তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর এই মহীয়সী পৃথিবী

ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে "সাহিবৎ-উজ-জামানি" অর্থাৎ যুগলসম্রাজ্ঞী উপাধি দেন। তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে সমাহিত করা হয় দিল্লীর শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধি ভবনের প্রাচীরের ভিতর। কবর ফলকে উৎকীর্ণ হলো তারই রচিত ফার্সী কবিতার চরণ।

বগায়ের সবৃজ না পোশদ কসে মজারে মরা
কে কবর-পোষে গরিবাঁ হামিন গিয়া বস অস্ত।[৪৮]

(তৃণগুচ্ছ ছাড়া আমার সমাধির উপর কোন আস্তরন করোনা। এই তৃণগুচ্ছই হোক অবমানিতার সমাধির আস্তরণ)

জেব উন নিসা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেব উন নিসা। মোগল হারেমের আরেক হীরক খন্ড। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন এই নারী একাধারে ছিলেন কবি, শিল্পী ও দানশীলা। দিলরাস বানুর গর্ভে তার জন্ম। সম্রাট আওরঙ্গজব কন্যার শিক্ষার প্রতি প্রথম থেকেই বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। বিদূষী মহিল হাফিজা মরিয়ামের নিকট তার শিক্ষা শুরু হয়; এই মহিলাই তাকে লালন পালন লেখা-পড়ার তত্ত্বাবধান করতেন। মীরবাই নামক আরো এক মহিলা শিক্ষকের নিকট তিনি আরবি শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ৪ বছর বয়সেই তিনি আরবি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারিনী শাহজাদী মাত্র সাত বছর বয়সেই সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্ত করে ফেলেন। এতে পিতা সম্রাট আওরঙ্গজেব খুশী হয়ে তাকে ত্রিশ হাজার স্বর্নমুদ্রা পুরস্কার দেন।[৪৯] এ উপলক্ষে সম্রাট আওরঙ্গজেব শাহীভোজ, প্রচুর দান খয়রাত এবং অফিস ২ দিন ছুটি দেন।[৫০] জেবউননিসা জ্ঞান চর্চার নানা ক্ষেত্রে অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি আরো যে সব শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন তারা হলেন মিয়াবাঈ, মোল্লা সাঈদ আশরাফ মাজান্দ্রানী ও মোল্লা আলী জিয়ন।[৫১]

জেব উন নিসা খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। জ্ঞান চর্চা ছিল তার একমাত্র সাধনা। তিনি হারেমের নিভৃত কক্ষে বসে রচনা করে গেছেন 'মাখফি' (concelead)।[৫২] তার রচিত বিখ্যাত সংকলনের নাম 'দেওয়ান-ই মাখফি'। তিনি আরবি, ফার্সী ও তুর্কি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তার হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর। নাসতালীক, নাসখ ও শিকাসতা[৫৩] এই তিন পদ্ধতিতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন।[৫৪]

জেব উন নিসা ব্যাপক জ্ঞান চর্চা করতেন। তিনি মোগল যুগের বৃহত্তম গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। তিনি পন্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করে অনেক মূল্যবান ও দুর্লভ পুঁথি- পুস্তক, পান্ডুলিপি ও ধর্মীয় বই সংগ্রহ করেন।[৫৫] অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন দেশ হতে দুর্লভ বই সংগ্রহ ও অনুবাদের ব্যবস্থা করেন তিনি।

সমসাময়িককালে এত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আর পরিলক্ষিত হয় না। কবি, সাহিত্যিক, পন্ডিত, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তার জ্ঞানভান্ডারে অধ্যয়ন করে জ্ঞান পিপাসা মেটাতেন। পন্ডিত ও পারদর্শী লেখদের জন্য তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৫৬]

জেব উন নিসা সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান চর্চাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে 'মুশায়ারা'র ব্যবস্থা করতেন।[৫৭] তিনি সাহিত্য চর্চার জন্য একটি সাহিত্য চক্র গড়ে তোলেন। এ সাহিত্য চক্রের অন্যতম সদস্য ছিলেন মীর্জা খলিল, শামস ওয়ালিউল্লাহ, বাহরাজ ও নাজির আলী সাইয়াব উল্লেখযোগ্য।[৫৮] তিনি তাদের সাথে সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। অনেক কবি সাহিত্যিক তার নিকট সাহিত্যকর্ম পাঠাতেন এবং অনুমোদন করে নিতেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ইমামী ছিলেন জেব উন নিসার ঘনিষ্ট সহচর।[৫৯] তিনি কবি সাহিত্যিকদের জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিতেন। তার উৎসাহে মোল্লা শায়খ উদ্দীন আর্দবেলী একজন খ্যাতিমান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

জেব উন নিসা সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত চর্চা করতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তার আদরিনী কন্যার সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় কোন বাধা দেননি।[৬০] তিনি শাহজাদীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কাব্যগুরু শাহ্ রুস্তম গাজীর অনুরোধে তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু দেশ হতে কবিদের এনে জেব উন নিসার সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দেন। শামস ওয়ালি উল্লাহ, নাসির আলী সাইয়েব, ব্রাহমিন, বেহরায় নামক প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে জেব উন নিসা সাহিত্য সাধনার সুযোগ পান।[৬১] সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সাহিত্য, সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

সেলিম গড় দূর্গে বসে জেব উন নিসা কাব্য চর্চা করতেন। ছোট ভাই আকবর পিতা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি ভাইকে সহযোগিতা করেন। এই অপরাধে জেব উন নিসাকে দুর্গে বন্দী করে রাখ হয়। বন্দী অবস্থায়ও তিনি কাব্যচর্চা করতেন। তার লেখা কাব্যগ্রন্থ বর্তমানে দূর্লভ। বন্দী জীবনে তার লেখা কবিতার কয়েকটি পঙক্তির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ-

'পারি না সহিতে আমি আর
তোমার বিচ্ছেদ আর তিক্ত এই মর্মগ্লানিভার;
নিপীড়িতা আমি প্রভু, মুক্ত কর আমার আত্মায়;
ক্লান্ত, ক্ষিন্ন, ভগ্নবুকে- মগ্ন আমি, হের, হতাশায়।'[৬২]
' কঠিন নিগড়ে বন্ধ, যতদিন চরন যুগল,
বন্ধু সবে বৈরী তোর, আর পর আত্মীয় সকল
সুনাম রাখিতে তুই করিবি কি সব হবে মিছে

অপমান করিবারে বন্ধু যে গো ফেরে পিছে পিছে।
এ বিষাদ কারা হতে মুক্তি তবে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখফী রাজচক্র নিদারুন বিরূপ কঠোর।
জেনে রাখ বন্ধু তুই শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই আশা নাই, খুলিবে না লৌহ কারাগার।'[৬৩]

মৃত্যুর কিছুকাল আগে শাহজাদী জেব উন নিসা নিম্নোক্ত কবিতা লিখেছেন বলে ধারণা করা হয়।

'বর মাযারে মা গরীবা না ছেরাগে নাগুলে
না পড়ে পরওয়ানা সুজদ না সদায়ে বুলবুলে।'[৬৪]
*(অধমের এই কবরে কেউ দীপ জ্বেলোনা এবং ফুল দিও না যাতে
শ্যামা পোকা পুড়ে মরে এবং বুলবুলী পাখি প্রতারিত হয়।)*

জেব উন নিসা বন্দী অবস্থাতেই ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে ২৬ মে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে লাহোরের 'তিন হাজারী' উদ্যানে সমাহিত করা হয়।

হারেমে নাচ গান ও উৎসব

মোগল সম্রাটগণ ভারতীয় সংগীতের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন। তারা ভারতীয় সংগীতকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। সম্রাট বাবর সঙ্গীত ভালবাসতেন এবং সঙ্গীতের উপযোগী করে তুর্কি ভাষায় কাব্যও রচনা করেন। সম্রাট হুমায়নও সঙ্গীত ভালবাসতেন। তার দরবারে প্রতি সোম ও বুধবার সঙ্গীতের আসর বসাতেন।[৬৫] সম্রাট আকবর সঙ্গীত শিল্পীদের বিশেষ সমাদর করতেন। তিনি মালওয়া, গোয়লিয়র, কাশ্মীর ও ইরান প্রভৃতি এলাকা হতে সঙ্গীত শিল্পীদের এনে দরবারে সঙ্গীতের আসর বসাতেন। তার দরবারে মিয়া তানসেন[৬৬] ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। আবুল ফজল তার সম্পর্কে বলেন, হাজার বছরের মধ্যে তার মত সঙ্গীত শিল্পী ভারতে জন্ম হয়নি।[৬৭] জাহাঙ্গীরও পিতার মত সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন। তিনি বাঁশির সুর পছন্দ করতেন। তার দরবারে অনেক সঙ্গীত শিল্পী উপস্থিত থাকতেন। শাহজাহানও সঙ্গীতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজে সুর সাধক ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথম দিকে সঙ্গীতকে ভালবাসলেও পরবর্তীতে তিনি সঙ্গীতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

সঙ্গীতের প্রতি মোগল সম্রাটগণের অনুরাগের কারণে হারেমের মহীয়সীরাও সঙ্গীতের প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েন। মোগল চিত্রকলায় দৃশ্যত হারেমে মহীয়সীদের সঙ্গীতে উৎসাহ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। হারেমে সঙ্গীত ও নাচের জন্য একজন মহিলা তত্ত্বাবধায়ক ছিল। তাকে 'কাঞ্চনী' বলা হতো।[৬৮] তার নেতৃত্বে হারেমে নাচ ও গানের আসর হতো। মহলে নাচ ও গানের আসরে মোগল মহীয়সীরা পর্দার আড়াল হতে

অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। রাজা মানসিংহের স্ত্রী রাণী 'মৃগনয়নী' হারেমের বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। হারেমের আরো একজন জনপ্রিয় পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী হলেন 'মীরাবাঈ'। সঙ্গীত শিল্পীগণ শোহলা ও ধ্রূপদ গাইতেন। সঙ্গীতে সুরের মূর্চ্ছনা সৃষ্টির জন্য তানপুরা, বীণা, দিলরুবা, ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো।[৬৯] শিল্পীদের অধিকাংশই ছিল গুজরাট ও মালওয়ার অধিবাসী। আবুল ফজল এইসব পেশাদার সঙ্গীত শিল্পীদের 'সেজদা তালী' নামে অভিহিত করেছেন।[৭০]

মোগল চিত্রকলায় হারেমের অভ্যন্তরে নৃত্য চর্চার তথ্য পাওয়া যায়। হারেমে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করা হতো। ভারতীয় হিন্দু রাজপুত ঐতিহ্যের ধারায় হারেমে রাত্রিকালীন 'প্রদীপ নৃত্য' ও 'চাচ নৃত্য' পরিবেশিত হতো।[৭১] এই নৃত্য মোগল হারেমে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

মোগল আমলে নববর্ষ নওরোজ নামে পরিচিত ছিল। নওরোজ অনুষ্ঠান হারেমের মহিলারা মহাসমারোহে উদযাপন করতেন। পারস্য দেশের নববর্ষের মাস ফারওয়ার দিনের প্রথম তারিখে নওরোজ অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণত ইংরেজি ২০/২১ মার্চ এ উৎসব পালিত হতো। এটি মোগলদের সর্ববৃহত্তম উৎসব হিসেবে বিবেচিত হতো। এই উৎসব ১৯ দিন পর্যন্ত চলতো।[৭২] উৎসবের এক মাস আগে থেকে এর আয়োজন চলতো। এ উপলক্ষে রাজপ্রাসাদ, বাগান, ব্যক্তিগত ও সরকারী প্রসাদ এমন কি রাজদরবারের জায়গাসমূহ সুসজ্জিত করা হত। সাধারণ লোকেরা তাদের বাড়ীঘর সাজাতো এবং ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরতো। গ্রাম এবং ছোট শহরের লোকেরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতো, দল বেঁধে রাজধানীতে যেত ।

নওরোজ উৎসবের সময় হারেমে একটি বিশেষ ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হত; যা মীনাবাজার নামে পরিচিত ছিল। এই মেলা ৬/৮ দিন স্থায়ী হতো। মহলের মহিলাদের আনন্দ-উৎসবের জন্য সম্রাট আকবর বড় আকারের মীনা বাজার প্রবর্তন করেন।[৭৩] এই মেলা হুমায়ূন কর্তৃক সর্বপ্রথম চালু হয়। এই ধরনের মেলার প্রচলন মোগলেরা তুর্কিস্তান থেকে গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৭৪] মীনা বাজার কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ছিল; সর্বসাধারণের জন্য ইহা খোলা ছিল না। আমীরদের স্ত্রী, কন্যা, হারেমের অন্যান্য মহিলারা এখানে সুন্দর সুন্দর দোকানঘর বসাত। বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য সামগ্রী যেমন হাতের তৈরী দ্রব্য, গহনাপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, রেশমী বস্ত্র, ফল, ফুল, কারুকার্য খচিত উন্নত বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, ও নানা হস্তশিল্প এ উৎসবে পাওয়া যেত। রাজপুত মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করত। সম্রাট, বেগমগণ, শাহজাদা, শাহজাদী ও অভিজাত অমাত্যগণ মীনা বাজারে ক্রেতা হিসাবে জিনিসপত্র ক্রয় করতেন। মেলার দ্রব্য সামগ্রী অনেক বেশী মূল্যে কেনাবেচা হত। ক্রেতাগণ জিনিসপত্রের দরদাম করতেন; অনেক

সময় একটি জিনিসের জন্য সম্রাট ও শাহজাদাদের দ্বিগুণ মূল্যে কিনতে হত। যে সব মহিলারা মেলায় জিনিসপত্র বেচাকেনা করত তারা ছিল খুবই সুন্দরী, আকর্ষনীয় ও কথাবার্তায় বাকপটু। মেলায় বিক্রেতাদের মধ্যে সবচেয়ে রসিক মহিলাকে সম্রাট বিশেষ পুরস্কার দিতেন। মেলা শেষে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা থাকতো।[৭৫] এই উৎসব সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত চালু ছিল।

মোগল হারেমে বড় ভোজের আয়োজন হত। ভোজ ছিল মোগলদের উৎসব অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য উপলক্ষ্যে প্রধান অংশ। হারেমের মহিলারা এতে অংশগ্রহণ করত এবং মাঝে মধ্যে তারা ভোজের আয়োজন করত। হুমায়নের মা মাহম বেগম হুমায়নের সিংহাসনে আরোহন উপলক্ষ্যে বড় ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ উপলক্ষে সম্রাট, আমীর ও সৈন্যগণের বাসস্থান আলোকিত ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল।[৭৬] সুন্দরী বালিকা, মহিলা ও সংগীতজ্ঞরা সুললিত কণ্ঠে সংঙ্গীত পরিবেশন করেন। খানজাদা বেগম, মাহম বেগম এ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মোগল হারেমে সম্রাট বা তাদের পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমক ও আমোদ-প্রমোদের সাথে উদযাপিত হতো। এসব অনুষ্ঠানে হারেমের মহিলারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে মেহেদী উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। বরকে নিয়ে রাস্তায় বিশাল শোভা যাত্রা বের করা হতো।[৭৭] এ সব অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতো। বিবাহের দিন তারিখ নির্ধারিত হলে বিবাহের উপহারাদীসহ কনের বাড়িতে যাওয়া হতো। এ উপলক্ষ্যে কনের বাড়ীতে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন হত। বিবাহের নির্ধারিত দিনে আমীরেরা সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আগমণ ঘটতো তারা সকলে শোভাযাত্রাসহ দেওয়ানী আমে পৌঁছত। সেখানে সম্রাট বরের মাথায় মুক্তার পাগড়ী পড়িয়ে দিতেন। তারপর কনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বিবাহের শোভাযাত্রা বের হতো। সেখানে পৌছে কাজী কর্তৃক বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। বিবাহ শেষে অতিথীদের আপ্যায়ন করা, বিবাহিত নবদম্পতীদের মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেওয়া হতো। মোগল ইতিহাসে শাহজাহানের সাথে মমতাজমহলের এবং দারাশিকোর সাথে নাদিরা বেগমের বিবাহ খুবই ব্যয়বহুল ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়।[৭৮]

মোগল হারেমে একটি বিশেষ দিনে সম্রাটকে মূল্যবান সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথর দ্বারা ওজন করা হতো। ওজন শেষে তা অত্যন্ত যত্নের সাথে লিখে রাখা হতো এবং পূর্ববর্তী বৎসরের ওজনের সাথে তুলনা করা হতো। পরের দিন সম্রাট ঐ সব দ্রব্যাদি গরীবদের মাঝে বিতরণ করতেন। সম্রাটকে ওজন করার এই প্রথা হুমায়নের সময় থেকে চালু হয় বলে জানা যায়।[৭৯] সম্রাট আকবরের সময় এই অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হতে দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানকে পর্যটকরা সম্রাটের জন্মদিন পালন বলে বর্ণনা করেছেন।[৮০] এই অনুষ্ঠানে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের

সময়েও চালু ছিল। এ উপলক্ষে হারেমে নাচ-গান ও ভোজের আয়োজন করা হতো। প্রচুর আনন্দ, আমোদ, প্রমোদ হতো। পাঁচদিন যাবত এই অনুষ্ঠান চলতো। সম্রাটকে আমীরগণ অনেক উপহার সামগ্রী প্রদান করতেন। কিছু আমত্য পদবী ও জায়গীর লাভ করতেন। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন।[৮১] এভাবে হারেমে বিভিন্ন সময়ে নাচ, গান ও নানা উৎসব পালিত হতো। মোগল মহীয়সীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নানা ক্ষেত্রে যে পদচারণা ছিল তা মোগল ইতিহাসকে অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মোগল হারেমের মহিলারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল না। তারা শিক্ষিত নারীর নিকট হতে ভাল শিক্ষা গ্রহণ ও পাঠাগারে পড়াশুনা করতেন। মূল্যবান সাহিত্যকর্ম রচনা করতেন, সংস্কৃতবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও গণশিক্ষায় উৎসাহ দিতেন। অল্প সংখ্যক মহিলা উচ্চ শিক্ষা এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও অধিকাংশ মহিলা এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। কারণ অল্প বয়সেই তাদের বিবাহ হত যার ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হতো। তবুও ভারতে মোগল শাসনামলে হারেমের মহীয়সীরা বিত্ত বৈভবের মধ্যে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তাদের মেধা, মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। ইতিহাস, সাহিত্য, কার্বচর্চা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা যে প্রতিভাদীপ্ত স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। তাদের অবদান সর্বযুগে নারী জাগরণ, উন্নয়ন অগ্রগতির সোপান হয়ে থাকবে।

তথ্যপঞ্জী :

১. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সীগন' (ঢাকাঃ *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্বিংশ খন্ড, হয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ- ২৫৭।

২. ইন্দ্রানী মুখার্জী, মোঘল হারেম কয়েকটি নির্দেশনা; *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৩ কলকাতা, ১৯৮৮ পৃ. ১৩৯।

৩. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ও রাজনীতিতে মুঘল নারী; *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুবাদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৮ম সংখ্যা ২০০২-৩, পৃ. ৫৭।

৪. সৈয়দা নূরে কাছেদা, ইসলামে নারীর স্বাধীকার ও বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট (*গবেষণা পত্রিকা,* কলা অনুবাদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯) পৃ. ৩৯।

৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* ,পৃ.১৬।

৬. RC Majumder et al, *An Advannced History of India,* p. 572.

৭. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম, (ঢাকা: *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা;* একত্রিশ বর্ষ, ১ম ৩য় সংখ্যা, ১৪০৪), পৃ. ১৮।

৮. আবুয যোহা নূর আহমদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী,* পৃ. ৬৬।

৯. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা*, পৃ. ১৭।

১০. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম, পৃ. ১৯।

১১. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম, পৃ. ২০।

১২. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম, পৃ. ১৮।

১৩. Ila Mukherjee, *Social Status of North Indian Women* (Agra: shiva lal Agarwala and company, 1972), p. 99

১৪. মোঃ মহিবুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সীগন' পৃ-২৬০।

১৫. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৩।

১৬. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৭।

১৭. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সীগন' পৃ. ২৬০।

১৮. *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৭১৯।

১৯. আবুয যোহা নুর আহমেদ, *মুসলিম সমাজের মহীয়সী নারী* , পৃ. ৭৩।

২০. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম, পৃ. ২৩।

২১. আবুয যোহা নুর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ৭৫।

২২. খজির খাজা খান ছিলেন বাবরের সহোদরা বোন খানজাদা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি হুমায়নের রাজত্বকালে আমিরুল ওমরা পদে উন্নীত হন। তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন।

২৩. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম,পৃ. ২৪।

২৪. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ৬৯।

২৫. মাহমুদ শামসুল হক, মুঘল হারেম- অন্দরের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৭৫।

২৬. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬১।

২৭. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সীগণ' পৃ. ২৬১।

২৮. Ila Mukharijee, *Social Status of North Indian Women*, p. 99

২৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৩।

৩০. Abul Fazl, *Ain-i Akbari*, vol. II, p. 309

৩১. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৪।

৩২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬২।

৩৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৫।

৩৪. এস এম জাফর রশীদ আল ফারুকী, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা*-(১০০০-১৮০০) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৮), পৃ. ১১৮।

৩৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৭০

৩৬. Rekha Misra, *Women in Mughal India*, p. 122-23.

৩৭. নাজমা খান মজলিস, 'মোগল জেনানা মহলে নারীর বেশভুষার উৎস ও বিবর্তনের ধারা', (ঢাকা:*এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুদশ খন্ড ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬), পৃ. ১৫
৩৮. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৭০-৭১
৩৯. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, p. 172.
৪০. হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডচিত্র*, (ঢাকা : অ্যাডন পাবলিকেশন, ২০০৫) পৃ. ৮৩।
৪১. শাহরিয়ার ইকবাল,*মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৭০।
৪২. এস এম জাফর রশীদ আল ফারুকী, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা*-(১০০০-১৮০০), পৃ. ১১৯।
৪৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৭৭।
৪৪. Ila mukterjee, *Social Status of North Indian Women*, p. 102
৪৫. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সীগন' পৃ. ২৬৫।
৪৬. আবুয যোহানুর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ৯৫।
৪৭. S. Ram Sharma, *Women's Education in Ancient and Muslim period*, (New Delhi: Discovery Publishing House,1996), p.88.
৪৮. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৮৮-৮৯।
৪৯. Saqi Mustad khan, *Masir-i-Alamgiri, (tr.), S. Jadu-nath Sarkar* (calcutta; Royal Asiatic Society of Bengal, 1947) p. 322
৫০. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ১১৩।
৫১. Rekha Misra,*Women in Mughal India*, p. 90
৫২. মাখফি শব্দটি ফার্সী শব্দ। মুল মখ শব্দের সাথে ফি যুক্ত হয়ে মাখফি হয়েছে। আরবী তাখাল্লুস শব্দ মাখফির সমার্থক শব্দ। যার অর্থ প্রশংসা বা গুণকীর্তন করা। মধ্য যুগে পারস্য দেশের কবিরা কাব্য রচনায় নিজের নাম গোপন করে লুকায়িত (concelead) বা ছদ্মনামে প্রশংসামূলক কাব্য রচনা করতেন। ফার্সী অনুকরণে তুর্কি ও উর্দু কবিতায় তাখাল্লুস বা মাখফি প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মোগল আমলে মহীয়সী নারীরা কাব্য রচনায় ফার্সী কবিদের অনুকরণে নিজের নাম গোপন করে লুক্কায়িত (concelead) মাখফি বা ছদ্মনামে কাব্য রচনা করতেন। বাংলা ভাষাতেও এর ব্যবহার দেখা যায়। কবি কাজেম আল কোরাইশী; আসল নাম গোপন করে কায়কোবাদ নামে কাব্য রচনা করতেন। (*ইসলামী বিশ্ব কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৫)
৫৩. নাসতালীক-ফার্সী, নাসখ-আরবী ও শিকাসতা-তুর্কী এই তিনটি ভাষায় জেবউননেসা ক্যালিগ্রাফী (Calligraphy)-তে পারদর্শী ছিলেন।
৫৪. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯৫।
৫৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯৫।
৫৬. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ১১৮।
৫৭. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯৫।

৫৮. মো. মহিব্বুল ইসলাম, মো. আতিয়ার রহমান, "মোগল হেরেমে সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির লালন: প্রসঙ্গ জেবউন নিসা" *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২য় সংখ্যা, ২০০১, পৃ. ১৬০।

৫৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯৫।

৬০. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, "মোগল হেরেমে সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির লালন: প্রসঙ্গ জেবউন নিসা"পৃ. ১৬১।

৬১. শাহনাজ কামাল, *মোগল মহলে*, পৃ. ৮৪।

৬২. মাহমুদ শামসুল হক, মুঘল হারেম- অন্দরের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৭৬।

৬৩. আবুয যোহা নূর আহমেদ, *মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী*, পৃ. ১১৯-২০।

৬৪. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, "মোগল হেরেমে সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির লালন: প্রসঙ্গ জেবউন নিসা" পৃ. ১৬৩।

৬৫. মোঃ মামনুর রশিদ, মোগল আমলে প্রাসাদ রাজনীতি, পৃ. ১৭১।

৬৬. ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পের সর্বশ্রেষ্ট রূপকার ও গুরু মিয়া তানসেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল রামতুনু পাঁড়ে। পিতার নাম মুকুন্দ্ররাম পাঁড়ে। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে বারানসীতে তার জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি বিন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত সাধক আচার্য স্বামী হরিদাসের নিকট সঙ্গীত শিখেন। গোয়ালিয়রের মুসলিম ধর্মগুরু ও সঙ্গীতবীদ মোহাম্মদ গাওছের নিকট তিনি সঙ্গীত সাধনা করেন এবং তার আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন। গোয়ালিয়র বসবাসকালে তিনি গাওছের মাধ্যমে বিখ্যাত সঙ্গীত সভা সংঘের সদস্য হন। এ সময় গোয়ালিয়রের সঙ্গীতজ্ঞ রাজা ও রানী মৃগনয়নীর সাথে তার পরিচয় ঘটে। হোসনী নামে মৃগনয়নীর একজন মুসলিম সঙ্গীত শিল্পীকে রামতুনু বিবাহ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার নাম হয় আতা আলী খাঁ। এক সময় তিনি সম্রাট আকবরের সঙ্গীত সভায় যোগ দেন। আকবর তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে তানসেন পদবী দান করেন। সেই থেকে তিনি মিয়া তানসেন হিসেবে পরিচিত হন। তানসেন অর্থ তান দ্বারা যিনি মুগ্ধ করেন। সম্রাট আকবরের দরবারে মিয়া তানসেন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। 'রাগমালা' ও 'সঙ্গীতসার' নামে ২টি সঙ্গীতের বই তিনি রচনা করেন। তিনি যন্ত্র সঙ্গীত, ধ্রোপদ সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীত জগত থেকে অবসর নেন; ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। *শিশু বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭) পৃ. ৭৭-৭৮।

৬৭. Abul Fazl, *Akbar Nama*, vol. III, p. 816.

৬৮. Abul Fazl, *Ain-I-Akbori*, vol. III, p. 272.

৬৯. Abul Fazl, *Ain-i-Akbori*, vol. III, p. 273.

৭০. Abul Fazl, *Ain-i-Akbori*, vol. III, p. 273.

৭১. Abul Fazl, *Ain-i-Akbori*, vol. III, p. 272.

৭২. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, vol, 1, p. 286.

৭৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ, ২০।
৭৪. Syed Ameer Ali, Islamic Culture Under The Moguls, (*Islamic Culture*), 1927, p.509.
৭৫. শাহরিযার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ, ২০।
৭৬. শাহরিযার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ, ১৯।
৭৭. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, p. 104
৭৮. Abdul Hamid Lahori, *Badshah Nama*, Vol. I, pp. 452-60.
৭৯. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, p. 106
৮০. Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, Vol. II. p. 348.
৮১. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, p. 107.

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোগল হারেম

মোগল হারেমের মহীয়সী নারীগণ রাজকীয় জীবন যাপনের মধ্যেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন যা ভারতের ইতিহাসে এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে। অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে মোগল নারীগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সমাজ উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের সাথেও মোগল নারীগণ জড়িত ছিলেন। রাজনীতির ন্যায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তারা ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। মোগল আমলে অর্থনীতির নানা দিক যেমন শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আভ্যন্তরীণ, বহিঃবাণিজ্য, লেনদেনসহ সর্বক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল এর পিছনে মোগল নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। বর্তমান অধ্যায়ে মোগল রাজকীয় নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অবদান তার বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মোগল হারেম

মোগল আমলে সম্রাটগণের পাশাপাশি বেগম, শাহজাদী তাদের আত্মীয় স্বজনগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও মোগল হারেমের অনেক মহিলা সক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতেন না, তবুও ঐ সময় অনেক মহিলা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিলেন; যেমন জাহাঙ্গীরের মা যোধবাই বা মরিয়ম উজ-জামানী, নূরজাহান বেগম এবং শাহজাদী জাহান আরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।[১] এছাড়াও আরো অনেকে পরোক্ষভাবে অর্থনীতিতে অবদান রেখে গেছেন। মোগল মহীয়সীগণ যে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো, জমি বরাদ্দ, শিল্পকারখানা স্থাপন, সমুদ্রপথে বাণিজ্য, হস্তশিল্প, বাজার নির্মাণ, জায়গীর লাভ ও রাজকীয় ফরমান জারী প্রভৃতি।

জমি বরাদ্দ ও জায়গীর লাভ

মোগল আমলে হারেমের মহীয়সী নারীদের বাৎসরিক ও মাসিক আয়ের ব্যবস্থা ছিল। তারা দুইভাবে অর্থ পেতেন। প্রথমতঃ জমি বরাদ্দের মাধ্যমে দ্বিতীয়তঃ সম্রাটের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া উপহার সামগ্রী। তাঁদের উপহারের অর্ধেক অংশ রাজকোষ হতে মুদ্রার মাধ্যমে দেওয়া হতো। অন্য অংশ দেওয়া হতো জমি বরাদ্দের মাধ্যমে। জমি বরাদ্দের প্রথা সর্বপ্রথম সম্রাট বাবরের সময় থেকে চালু হয়।[২] সম্রাট বাবর তার মাকে যে জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন তৎকালীন মূল্যে তার বাৎসরিক আয় ছিল সাত লক্ষ টাকা। সম্রাট হুমায়ন তার বাবার পথ অনুসরণ করে তার মা ও বোনদের জমি বরাদ্দ

দিয়েছিলেন।[৩] পরবর্তী মোগল সম্রাটগণও মহিলাদের জমি বরাদ্দের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন।

নূরজাহান বিশাল জায়গীরের অধিকারীনি ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জায়গীর প্রদান করেছিলেন। এসব জায়গীর লাভের মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হন। রামসার জায়গীর, টোডার পরগনা ও সুরাট বন্দর হতে নূরজাহান বিপুল অর্থ পেতেন। রামসার জায়গীর আজমীর হতে বিশ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত ছিল। টোডার পরগনা আজমীরের আশি মাইল দক্ষিণ পুর্বে অবস্থিত। সুরাট বন্দর হতে নূজাহান তৎকালীন মূল্যে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা রাজস্ব পেতেন; শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য বিজয় উপলক্ষ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে উপহার হিসেবে উহা দিয়েছিলেন।[৪] নূরজাহান কখনও তার টাকা অপচয় করতেন না। তিনি তার বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত প্রশাসন তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। এসব সম্পদ ছাড়াও তার স্বামী তাকে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। তিনি অনেক লোকের উপহার পেতেন।

হারেমের মহিলাদের যে সকল জায়গীর প্রদান করা হতো তার নাম ছিল 'বুরগবাহ'।[৫] সকল সম্পত্তি দেখাশুনা ও পরিচালনার জন্য নাজীর নামে কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। নুরজাহানের সময়ে তারা ওয়াকিল এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজের সময় 'মীর-ই সামান' পদ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। শাহজাদী জাহানারা তাদের পদবী দিয়েছিলেন 'হাকিকত খান'।[৬]

সমুদ্র বাণিজ্য

মোগল সম্রাটগণ দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এ ক্ষেত্রে সমুদ্র পথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিরাট সুযোগ ছিল। মোগল আমলে সমুদ্র পথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তাতে সম্রাটদের পাশাপাশি মোগল নারী, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও আমীরগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন; যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে বিরাট অবদান রেখেছিল। মোগল সম্রাটদের নিজস্ব জাহাজ ছিল যা সমুদ্র বাণিজ্যে ব্যবহার করা হতো। সমুদ্র বাণিজ্যের প্রতি সম্রাট আকবরের বিশেষ মনোযোগ ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর সরাসরি সমুদ্র পথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন এবং তার নিজস্ব বাণিজ্যিক জাহাজ ছিল। সম্রাটদের পাশাপাশি মোগল নারীরাও সমুদ্র পথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

যোধ বাঈ

সম্রাট আকবরের স্ত্রী যোধবাই সমুদ্র পথে সর্বপ্রথম ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করেন।[৭] সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যে তার বড় আগ্রহ ছিল। মালামাল পরিবহনে তার নিজস্ব

জাহাজ ছিল। এ কাজে চারশত হতে পনের শত টনের জাহাজ এবং ত্রিশ হতে চারশত টনের চায়না আকৃতির জাংক জাহাজ ব্যবহার করা হতো।[৮] এছাড়া রানীমাতা মরিয়ম-উজ-জামানীর 'রাহিমি নামে' একটি জাহাজ ছিল যা মক্কার জেদ্দা বন্দরে হজ্জ যাত্রী আনা নেওয়া করতো। এর ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৫০০ যাত্রী। রানীমাতার ঐ জাহাজটিকে বিদেশী পর্যটকরা কেউ 'রিহীমি' কেউ 'রিমি' আবার কেউ 'সুরাটের রাহিমি' বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] এসব জাহাজে ভারতবর্ষ হতে পরিধেয় বস্ত্র, গোলমরিচ, মশলা, আদা, রঙ, ইত্যাদি পণ্য রপ্তানী করা হতো এবং আরব, পারস্য ও আফ্রিকা হতে সোনা, রূপা, হাতির দাঁত, মুক্তা, ব্রোকেড, সুগন্ধী, আতর, চীনা মাটির তৈজষপত্র প্রভৃতি আমদানী করা হতো।[১০]

মোগল সম্রাটগণ হারেমের রাজকীয় মহিলাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাদের ব্যবসার উন্নতির জন্য সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা, তাদের মালামাল ও জাহাজের নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা রানীমাতা যোধবাঈয়ের একটি জাহাজ লুট করেছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্তুগীজদের এই রূপ আচরনে খুবই রাগান্বিত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের সকল ব্যবসা বন্ধের আদেশ দেন। তিনি পর্তুগীজদের দামান শহর অবরোধ করার আদেশসহ মোকাররব খানকে সুরাটে প্রেরণ করেন। এই সময় আগ্রায় তাদের জিসার্ট চার্জ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন উভয় পক্ষের মধ্যে একটি প্রাথমিক শান্তি চুক্তি ও সমঝোতা হয়। এতে সুরাট হতে পর্তুগীজদের বহিস্কার, আটকৃত মালামালের ক্ষতিপূরণ এবং রানীমাতাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি জাহাজ দেওয়া হয়।[১১]

নূরজাহান

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান ব্যবসায়-বাণিজ্যে তার শাশুড়ি যোধবাই এর চেয়ে বেশী অগ্রগামী ছিলেন। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতির ন্যায় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নূরজাহান বেগমের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ তার শাশুড়ী যোধবাই এর মত শুধু সামদ্রিক বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। নূরজাহানের কয়েকটি জাহাজ ছিল। তার জাহাজ বহিঃবাণিজ্য আমদানী ও রপ্তানী কাজে ব্যবহৃত হতো। তাঁর জাহাজগুলি সুরাট ও আরব উপকূলের বন্দরের মধ্যে চলাচল করত। নূরজাহানের এই ব্যবসায়-বাণিজ্যে তার ভাই আসফ খান নিয়োজিত ছিলেন।[১২]

নূরজাহান প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীন বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। পুর্তগীজের সাথে তার যৌথ বাণিজ্য ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় রাণীমাতার একটি জাহাজ নিয়ে পুর্তগীজ ও মোগলদের সাথে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন তার মালামাল বিদেশে নিতে সমস্যা হতে পারে। তাই তিনি

ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর চেষ্টা করেন। যাতে তার মালামাল পরিবহনে ইংরেজরা তাকে সাহায্য-সহযোগীতা করেন।[১৩] নিল ও কারুকার্য করা বস্ত্র ছিল নূরজাহানের প্রধান রপ্তানী পণ্য। এছাড়াও আগ্রার উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য যমুনা নদী দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো। এবং পূর্বাঞ্চল বাংলা ও ভূটান হতে খাদ্য শস্য, মাখন ও অন্যান্য পণ্য জাহাজে করে আমদানী করা হতো। এসব আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বাণিজ্যে নূরজাহান গভীর মনোযোগ প্রদান করেছিলেন এবং ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন।

জাহান আরা

শাহজাহানের রাজত্বকালে তার বড় কন্যা জাহান আরা বেগম ছিলেন মোগল রাজপরিবারের একমাত্র মহিলা; যিনি ঐ সময়ের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমৃদ্ধিশালী সুরাট বন্দরের রাজস্ব তাকে দেওয়া হত। তিনি তাঁর গোটা পরিবারে টাকা খরচ করতেন। তিনি পানিপথ পরগণা থেকে তৎকালীণ মূল্যে বার্ষিক এক কোটি টাকা রাজস্ব পেতেন। পিতার প্রশাসনে জাহান আরার ব্যাপক প্রভাব ছিল।[১৪] জাহান আরা বেগম বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তার সম্পদ বিনিয়োগ করেন। বিনিময়ে তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেন। তিনি কয়েকটি জাহাজের মালিক ছিলেন। পর্তুগীজ ও ইংরেজদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। তারা তাকে ব্যবসা পরিচালনায় সাহায্য করতেন। জাহানা আরা বেগমের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জাহাজকে 'সাহেবী জাহাজ' বলা হত। তার ব্যবহৃত সাহেবী জাহাজটি সুরাটে তৈরী করা হয়েছিল। এই জাহাজে হজ্জযাত্রীদেরকে আনা নেওয়া করা হতো। সাহেবীকে মক্কা মদিনার হজ্জ যাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল। হজ্জযাত্রীর নিকট হতে কোন ভাড়া নেওয়া হত না। জাহাজটি জেদ্দা হতে ফেরত আসার সময় ঘোড়া ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে আসতো। সাহেবী জাহাজটি ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।[১৫]

বাজার নির্মাণ

মোগল নারীগণ বাজার নির্মাণ করেন সেখানে প্রচুর বেচাকেনা হতো। এর ফলে তারা অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধশালী হন। জাহান আরা বেগম দুটি বাজার নির্মাণ করেন। তার একটি লাহোরে অন্যটি দিল্লীতে অবস্থিত। শহরের গুরুত্বপুর্ণ ঐ বাণিজ্যকেন্দ্রে বিদেশী বণিকরা তাদের মালামালসহ আসত। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে জাহান আরার উদ্যোগে দিল্লীতে বিখ্যাত চাঁদনী চক নামক ব্যবসা কেন্দ্র নির্মিত হয়।[১৬] এটি দিল্লির লালকেল্লা দূর্গে লাহোর দরজার বিপরীতে অবস্থিত। চাঁদনী চক কেন্দ্রে একটি জলাশয় ছিল; চাঁদনীরাতে গোটাস্থাপনা ও জলাশয় রূপার সদৃশ চন্দ্রের ঝিকিমিকি আলোয় আলোকিত হতো বলে একে চাঁদনী চক বলা হতো। চাঁদনী চকের প্রত্যেক শেষ প্রান্তে একটি সুন্দর

সুসজ্জিত দরজা ছিল। মোগলদের সময় চাঁদনী চক ছিল বিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা কেন্দ্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা হতে ও বিদেশ হতে এখানে বণিকরা আসত। প্রত্যেক দোকানে উন্নতমানের দ্রব্য পাওয়া যেত এবং দ্রব্যের বিশেষত্ব ছিল। অলংকারের দোকানে চমৎকার অলংকার ও মুক্তা বিক্রয় হত। সেখানে নানা রকমের ফলের দোকান ছিল। আফগানিস্তান ও কাশগড়ের পছন্দসই ফল সেখানে বিক্রি হতো। অনেক দোকানে বিভিন্ন প্রকার পাখি ও পোষা প্রাণী বিক্রয় হতো। এখানে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য ছিল খুবই মূল্যবান। ধনী ও আমীরেরা প্রায়ই চাঁদনী চকে বাজার করার জন্য আসত। চাঁদনী চক বর্তমানে রাজধানী দিল্লীর একটি সর্বাধিক ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র।

বস্ত্র শিল্প কারখানা নির্মাণ

মোগল হারেমের মহীয়সী নারীগণ নিজেদের প্রয়োজনে বস্ত্র শিল্প কারখানা নির্মাণ করেন। তারা নিজেদের সুসজ্জিতকরণের জন্য পরিশীলিত পোষাক পরিধান করতেন। উন্নতমানের তুলা, রেশম ও পশমের তৈরী মূল্যবান পোষাক তারা পরিধান করতেন। বিশেষ করে ডোরাকাটা রেশমী ও মসলিন কাপড়ের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল বেশী। কেবলমাত্র রাজকীয় মহিলারাই মসলিন কাপড় ব্যবহার করতেন। অনেক সময় মসলিন কাপড়ে সোনার সূতাও ব্যবহৃত হত। তারা তিন ধরনের মসলিন কাপড় ব্যবহার করতেন, আবে-ই বাওয়ান, বাফট হাওয়া ও শবনম।[১৭] এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র যেমন মাটিন, কিংখাপ, কাখান, তাছার, টাফটা, আম্বারী, এটলাস প্রভৃতি ব্যবহার করত। পৃথিবী বিখ্যাত ঢাকা মসলিনও ব্যবহার করত; যা তাদের কাছে শবনম নামে পরিচিত ছিল।

মহিলাদের জামা তৈরী করার জন্য চীন, পারস্য, বেনারস, বাংলা ও উড়িষ্যা থেকে প্রচুর পরিমাণ রেশম আনা হতো। এ সব রেশম দিয়ে রাজকীয় মহিলাগণ সুদক্ষ জামা প্রস্তুত কারকদের দ্বারা সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ ও নিখুঁতভাবে কারুকার্য করা জামা তৈরী করতেন। মোগল মহিলাদের অলংকারাদি, রাজপ্রাসাদের সাজসজ্জার উপকরণ, আসবাবপত্র, আয়না, ফিতা, গালিচা, জুতা, লেপ, বিছানার চাদর, বালিশের আবরণ, শাল ও অন্যান্য জিনিস দক্ষ শিল্পির দ্বারা রাজকীয় কারখানায় প্রস্তুত করা হতো। কিছু জিনিস যেমন গালিচা পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে আনা হতো।[১৮] অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের এই ভূমিকা অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

নূরজাহানের আগ্রহ ও উৎসাহে আগ্রাতে একটি হস্তশিল্প কারখানা এবং একটি বাজার নির্মাণ করা হয় যার নাম কেনারী বাজার। সেখানে হস্তশিল্পিরা বিখ্যাত কিংখাপ বস্ত্র তৈরী করতো। তার তত্ত্বাবধানেই পোষাক, গালিচা, গহনাপত্র তৈরীর কারখানা সুখ্যাতি লাভ করেছিল। অনেক দক্ষ হস্তশিল্পি বা কারিগর এইসব কারখানায় চাকুরী পেয়েছিল।

রাজকীয় ফরমান জারী

মোগল আমলে যে সব রাজকীয় ফরমান জারী হতো তার উপর সীলমহর বসাতেন হারেমের প্রধান কর্ত্রী। এ সীলমহরের নাম ছিল উযুক। মোগল আমলে রাজকীয় ফরমান জারীর ক্ষমতা শুধুমাত্র সম্রাটের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মাত্র কয়েকজন মহীয়সীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। সে সময় যে সব বেগম ও শাহজাদী এইরূপ ফরমান জারীর ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হামিদা বানু বেগম, নূরজাহান ও শাহজাদী জাহানারা। এসব ফরমানের মাধ্যমে তারা অনেক অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।[১৯] নূরজাহানই প্রথম মুসলিম নারী যার নাম স্বর্ণ মুদ্রাতে খোদাই করা হয়েছিল।

সামাজিক উন্নয়নে মোগল হারেম

মোগল হারেমের মহীয়সী নারীরা সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে তারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, লাইব্রেরী স্থাপন, মক্তব প্রতিষ্ঠা, মসজিদ নির্মাণ, সরাইখানা ও উদ্যান নির্মাণসহ নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে তাঁরা জড়িত ছিলেন।

শিক্ষার উন্নয়ন

হারেমের মহিলারা শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী থাকার জন্য রাজকোষ হতে বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা ছিল।[২০] হুমায়নের স্ত্রী বেগা বেগম হুমায়নের সমাধীর নিকট একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মাহম আনগা মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন; তা কাহির-উল-মানজিল নামে পরিচিত ছিল।[২১] যার সাথে একটি মসজিদও সংযুক্ত ছিল। শাজাহানের রাজত্বকালে আগ্রায় শাহজাদী জাহানারা শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মানবিক সাহায্য প্রদান

হারেমের মহিলারা দানশীলা ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মাহম বেগম অসহায় গরীবদের মাঝে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিতরণ করেছিলেন। হুমায়নের স্ত্রী বেগা বেগম হজ্ব যাত্রাকালে গরীবদের মাঝে তাদের প্রয়োজন অনুসারে বিপুল অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সম্রাট আকবরের ফুফু গুলবদন বেগম ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালন শেষে দেশে ফিরে অনাথ বালিকাদের মধ্যে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করেছিলেন।[২২] সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নিজ অর্থ খরচ করে রাজকীয় সৈন্যদের বিবাহ ব্যবস্থা করতেন। সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলও ছিন্নমূল অসহায় নারী ও শিশুদের মাঝে অর্থ দান করে তৃপ্তি পেতেন। তিনি অনেক এতিম বালকের বিবাহের দেন মহরের অর্থ তিনি নিজের তহবিল থেকে পরিশোধ করতেন। তাঁর সুপারিশে হাকিম রোকনাকাশীকে

রাজকোষ হতে চল্লিশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল। অনাথ, এতিম ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের রাজকোষ হতে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা তার সুপারিশেই হয়েছিল। শাহজাদী জাহানা আরাও ছিলেন ধার্মিক এবং দানশীলা। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর তিনি হারেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সম্রাট শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হলে শাহজাদী জাহান আরা তাঁর সুস্থতার জন্য গরীবদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শাহজাহানের মৃত্যুর পর বাবার আত্মার শান্তির জন্য তিনি দুই হাজার সোনার মুদ্রা গরীবদের মাঝে বিতরণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের কন্যা জেব উন নিসা তিনিও অনেক দানশীলা ছিলেন। তাঁর দানের উপর অনেক গরীব পরিবার নির্ভরশীল ছিল।

স্মৃতিসৌধ ও সরাইখানা নির্মাণ

মোগল মহীয়সীদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য শিল্পেরও চরম উৎকর্ষকতা সাধিত হয়েছিল। হারেমের মহীয়সী নারীগণ স্থাপত্য উদ্যান ও সরাইখানা নির্মাণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। উদ্যান নির্মাণে মোগল মহীয়সীরা এক নবযুগের সূচনা করেন। এদের মধ্যে বাবরের স্ত্রী মোবারিকা বেগম, হুমায়নের স্ত্রী হাজী বেগম, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও শাহজাদী জাহান আরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাজী বেগম হুমায়নের সমাধির উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এ অনিন্দ্য সুন্দর স্মৃতিসৌধে পারসিক ও ভারতীয় রীতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষনীয়।[২৩] এছাড়া আগ্রা হতে বায়ানা যাবার পথে তিনি একটি মহল ও বাগানও নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের স্ত্রী সেলিমা সুলতান বেগম মান্দাকার বাগে স্মৃতিসৌধ তৈরি করেছিলেন। এই স্মৃতিসৌধেই ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা মরিয়ম উজ-জামানী জাসুদ এলাকায় বাঙালী পদ্ধতির সিঁড়ি বিশিষ্ট ইদারা নির্মাণ করেছিলেন। সেটা নির্মাণে ঐ সময়ই ব্যয় হয়েছিল আনুমানিক বিশ হাজার টাকা। সম্রাজ্ঞী নূর-জাহান পাটনাতে সরাইখানা হিসাবে একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলা, স্বামী জাহাঙ্গীর ও নিজের স্মৃতি স্মরণীয় করতে তিনি সমাধিও তৈরি করেছিলেন। তিনি আগ্রায় যমুনার তীরে দ্বিতল বিশিষ্ট আরও একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন যার অলংকরণ ও কারুকার্য মোগল স্থাপত্যসমূহের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে মনে করা হয়।[২৪] তিনি নূরসরাই-এ তার ভোকিলদের নিয়ে একটি সরাইখানা ও বাগান নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণ কাজ শেষে তিনি এক শাহীভোজের ব্যবস্থাও করেছিলেন। সেকেন্দারাবাদেও নূরজাহান অনুরূপ আর একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন মহিলা কর্মচারী আক্কা বেগম ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট শাজাহানের শাসন আমলে জাহান আরা আগ্রায় একটি মসজিদ নিজ অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন। লাহোরের চক বাজারের দালানগুলো তারই পরিকল্পনার ফসল।

তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় কাশ্মীরে বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এতিম বালিকাদের জন্য একটি এতিমখানা, দিল্লীতে প্রশস্ত বাগান ও দিঘীসহ উন্নত মানের সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন।[২৫] আগ্রার বিখ্যাত নির্মিত মতি মসজিদ তাঁর অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর কারণে আজও দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেগ করে। জাহান আরার নির্মিত উদ্যান 'বাগ-ই জাহান আরা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত।
সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জিনাত উন নিসা প্রায় চৌদ্দটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাদী জাহান আরার দিল্লীতে যে প্রশস্ত বাগান ও দিঘীসহ সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন তাতে মোগল ও পারসিক বণিকেরা বিশ্রাম করতেন। শাহজাদী জাহান আরা দিল্লী, লাহোর, আগ্রা, কাবুল, কাশ্মীরসহ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে অনেক ইমারত, উদ্যান ও সরাইখানা নির্মাণ করে জনগণের সেবা করেছেন। আগ্রায় তাঁর নির্মিত সরাইখানাটি 'বেগম সরাই' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই সরাইখানায় নারী পুরুষ সবার জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। এর তোরণ ও কক্ষগুলো ছিল অত্যন্ত সুসজ্জিত যা ভারতের বিখ্যাত সরাইখানাগুলোর মধ্যে অন্যতম।[২৬]

মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের চিন্তায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মনোমুগ্ধকর উদ্যান ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার 'বাগ-ই নূর', লাহোরের শাহদারাতীর উদ্যান, কাশ্মীরের নূর আফজা ও আকবাল বাগ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। কাশ্মীরে তিনি বেশ কয়েকটি বাগান ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করেন। কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর তীরে তার মনোমুগ্ধকর নূর আফজা বাগানটি প্রকৃতি প্রেমিকদের জন্য খুবই উপভোগ্য। গ্রীষ্মকালে নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীর সেখানে অবকাশ যাপন করতেন। ভারনাগবাগের অপরূপ সৌন্দর্য ও নূরজাহানের সান্নিধ্যের সুখ স্মৃতি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বারবার দোলা দিত। তাই তিনি জীবন সায়াহ্নের শেষ প্রান্তে কাশ্মীরের এই বাগে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন।[২৭] কাশ্মীরের এই সরাইখানা, সুন্দর অট্টালিকা, হাম্মামখানা, পানির প্রবাহ ধারা, ফোয়ারা ও নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছে সুসজ্জিত ছিল। এই সরাইখানা নূর আফজা নামে পরিচিত ছিল। কাশ্মীরে জাহানারার তিনটি বাগান ছিল। সেগুলোর নাম 'বাগ-ই আয়শা' 'বাগ-ই-নূর আফসান', 'বাগ-ই-সাফা'। এই তিনটি বাগানের নকশা তৈরি করেন জওহর খান খাজা। শাহজাদী রওশন আরা দিল্লীর নিকট একটি বাগান তৈরি করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের অন্যতম স্ত্রী বিবি আওরঙ্গবাদী কাশ্মীর ও লাহোরের অনুকরণে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বাগান তৈরি করেছিলেন।

মোগল আমলে মহল বা উদ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে পারসিক ও ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় ছিল। মোগল আমলে নির্মিত সকল স্থাপত্য ও উদ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে উভয় সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটেছিল। বাবরের স্ত্রী মোবারিকা বেগম হুমায়নের স্ত্রী মরিয়ম মাকানি,

বাবরের ফুফু শাহর বানু, জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম উজ-জামানী, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, শাহজাদী জাহান আরা ও রওশন আরা নির্মিত এসব স্থাপত্য ও উদ্যান মোগল মহীয়সী নারীদের সৌন্দর্য বোধ ও সংস্কৃতি মনের পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। শাহজাদী জেব-উন নিসা লাহোরে 'চত্তবর্গ' নামে একটি বাগান নির্মাণ করেছিলেন। এতে তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লাহোরে তিনি 'চৌধুরী' নামে চিত্তাকর্ষক আরও একটি উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। অপরূপ কারুকার্য খচিত ও টাইলস দিয়ে এই উদ্যানের তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। তোরনটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই মহীয়সী শেষ জীবনে সলিমার দূর্গে বন্দী অবস্থায় জীবন কাটান এবং লাহোরের সন্নিকটে নাওয়াকোটে তাঁর প্রিয় 'তিন হাজারী' উদ্যানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৮]

বিবাহকার্য সম্পাদনে সহযোগিতা

মোগল মহীয়সীগণ বিবাহকার্য সম্পাদনে ও নানাভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। বর-কণের মধ্যকার যোগসূত্র স্থাপনসহ বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে তারা অর্থ সাহায্য করতেন। সম্রাট বাবরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী খানজাদা বেগম, তার স্ত্রী মাহম বেগম ও তাঁর ফুফুরা বিবাহের যোগসূত্র স্থাপনে আনন্দবোধ করতেন। বাবরের গুরুতর অসুখের সময়ে তাঁর কন্যাদ্বয় গুলরঙ বেগম ও গুলচেরা বেগমের বিবাহ যথাক্রমে এহসান তৈমুর সুলতান ও তুখতা বুখা সুলতানের সাথে সম্রাজ্ঞী মাহম বেগমের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। হুমায়নের ভগ্নী গুলবদন বেগমের মাইওয়াজান নামে এক অপরূপা রূপসী দাসী ছিল। সম্রাজ্ঞী মাহমের নির্দেশে হুমায়ন মাইওয়াজানকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন।[২৯] বাবরের অন্য একজন স্ত্রী দিলদার বেগম এ বিষয়ে পটু ছিলেন। মীর বাবা দোস্ত এর কন্যা হামিদা বানু বেগমের সাথে হুমায়ুনের বিবাহের সফল যোগসূত্র দিলদার বেগমই করেছিলেন। আকবরের ধাত্রী মাহম আনাগা অনেক বিবাহের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। হামিদা বানু বেগমের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে বাবরের কন্যা গুলগাদারের মেয়ে সেলিমা সুলতান বেগমের বিবাহ বৈরাম খানের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। শাহজাহান কন্যা জাহান আরা তার ভ্রাতাদের বিবাহ ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের জীবিতাবস্থায় পুত্র দারাশুকোর, চাচাত বোন নাদিরার সাথে বাগদান হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর জাহান আরা এ অনুষ্ঠানে সম্পন্ন করেন। এ বিষয়ে পরলোকগত সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের উকিল সাত্তি উন নিসা জাহান আরা কে সহযোগীতা করেছিলেন। আওরঙ্গজেব ও সুজার বিবাহ ব্যবস্থা ও জাহান আরাই করেছিলেন।

১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে দারাশিকোর পুত্রের সাথে আওরঙ্গজেব কন্যা জুবতাতুন নিসার বিবাহ হয়। সম্রাট শাহজাহান কন্যা গওহর আতা বেগম এই বিবাহের অভিভাবকত্ব করেছিলেন। মোগল মহীয়সীগণ এসব বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। সম্রাট আকবরের মাতা হামিদা বানু বেগমের নিজ মহলে শাহজাদা সেলিম ও মুরাদ এবং শাহজাদী শকরুন নিসার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীরের মাতা মরিয়াম উজ-জামানীর প্রাসাদে জাহাঙ্গীর, পারভেজ ও

লাডলী বেগমের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে দারাশিকোর কন্যা জাহানজেব বেগমের বিবাহ শাহজাদী জাহান আরার মহলে অনুষ্ঠিত হয়।

ভোজ ও অন্যান্য উৎসব

মোগল হারেমে বিশেষ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করা হত। হুমায়ন সিংহাসন লাভের পর তার মা রাজকীয় ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সময় গোটা হারেমকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা হিন্দালের বিবাহের পর ফুফু খানজাদা বেগম শাহী খানার ব্যবস্থা করেছিলেন। হুমায়ন এবং হামিদা বানুর বিবাহ উপলক্ষে দিলদার বেগম রাজকীয় ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের খাৎনা উপলক্ষে হামিদা বানু প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে আকবরের পালকমাতা মাহম আনগা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে হারেমে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়াও হারেমে শাহজাদা ও শাহজাদীদের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ শাহী ভোজের ব্যবস্থা করা হতো। এসব অনুষ্ঠানে মোগল সম্রাটগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলতেন।[৩০] হারেমের মহীয়সীগণ নওরোজ অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে পালন করতেন। এ অনুষ্ঠানে মোগল সম্রাট, আমীর, হারেমের অভিজাত মহিলা ও জমিদাররা অংশগ্রহণ করতেন। অনুষ্ঠান শেষে ভোজের ব্যবস্থা থাকতো।[৩১]

হজ্জব্রত পালন ও জিয়ারত

হুমায়নের বোন গুলবদন বেগম ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যাদের নিয়ে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আরবে তারা সাড়ে তিন বছর অবস্থান করে চার বার হজ্জ পালন করেছিলেন। আকবরের স্ত্রী সেলিমা সুলতান বেগম, চাচী সুলতানুম বেগম, আশকারী মীর্জা, হাজী বেগম, গুলজার বেগম প্রমুখ নারীরা এই হজ্জ কাফলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন সময় এসব মহীয়সী নারীরা দিল্লীর নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার মাজার ও আজমীরে খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তীর মাজার জিয়ারত করতেন।[৩২]

পরিশেষে বলা যায়, মোগল শাসনামলে হারেমের মহীয়সীরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। যদিও কম সংখ্যক মহীয়সী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তার পরেও বলা যায় মোগল আমলে সম্রাটগণের উদার নীতির কারণে হারেমের মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্নভাবে অর্থ সম্পদ লাভ এবং তার ব্যবহারে তারা ছিলেন স্বাধীন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতার কারণে তারা নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করতেন। তাদের উদ্যোগে স্থাপত্য, উদ্যান, সরাইখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠে। দুঃস্থ ও গরীব মানুষের সেবায়ও তারা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সবকিছু মিলে অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তাদের অবদান কম নয়। ভারতীয় ইতিহাসে তারা কীর্তিমান মহীয়সী হিসেবে চির জাগরুক হয়ে আছেন।

তথ্যপঞ্জী :

১. Soma Mukherjee, *Royel Mugal Ladies And Their Contribution*, p. 236.
২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১২।
৩. তদেব, পৃ. ১২।
৪. Nur-ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri*, Vol. 1, p. 380.
৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৩।
৬. তদেব, পৃ. ১৩।
৭. Jagdish Narain Sarkar, *Mughal Economy*, p.193.
৮. *Ibid*, p. 193.
৯. J.N. Sarkars, *Studies In Economic Life in Mughal India*, P. 274; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৪।
১০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৪।
১১. William Foster ed, *Early Travels in India*, p. 191-192; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৪।
১২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ,. ১৪।
১৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৩।
১৪. তদেব, পৃ. ৮৪-৮৬।
১৫. Shireen Moosvi, Mughal Shipping at Surat in the First Half of 17th Century, p. 311-313.
১৬. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ,. ৮৭।
১৭. K.S Lal,*The Mughal Harem*, p. 122.
১৮. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ২৬-২৭।
১৯. ইন্দ্রাণী মুখার্জী, মোগল হারেম কয়েকটি নির্দেশ নামা, *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৩ কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪০।
২০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১৪।
২১. Soma Mukherjee, *Royel Mugal ladies And their Contribution* ,p. 169.
২২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ২২।
২৩. Rekha Misra, *Woman in Mughal India*, p.119.
২৪. K.S. Lal, *The Mughal Harem*, p. 75.
২৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ২৩।
২৬. Rekha Misra, *Woman in Mughal India*, p.119.
২৭. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ২৩।
২৮. Jadunath Sarkar, *A Short History of Aurangzib*, p. 152.
২৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ.২৪।
৩০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ২০।
৩১. Rekha Misra, *Woman in Mughal India*, p.96.
৩২. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* , পৃ. ২০-২১।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মোগল প্রশাসনে হারেমের প্রভাব

জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক মোগল বংশ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ শাসনকালে ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল, উপমহাদেশের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। মোগল নারীদের জীবন মূলত হারেমের মধ্যেই আবর্তিত হতো। হারেমের মধ্যকার বিলাস বহুল ও সুখী জীবনযাপন, জীবনের আনন্দ উপভোগ ইত্যাদিতে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মোগল নারীরা তাদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে মোগল যুগীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছেন।

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তারকারী মহীয়সীগণ

ভারতবর্ষে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের রক্তে চেঙ্গিস ও তৈমুরের রক্ত প্রবাহিত ছিল। পিতা ওমর শেখ মীর্জার ফরগনা রাজ্য হারিয়ে বাবর ভারতবর্ষে আসেন। ভারতের উত্তর অংশ হতে দক্ষিণ অংশ এবং পূর্ব হতে পশ্চিম অংশে মোগলদের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মোগলরা ছিল দেশের প্রথম শাসক শ্রেণী যাদের রাজ্য প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষকে স্পর্শ করেছিল।[১] তারা দক্ষতার সাথে দেশ শাসন করে তাদের অধীনস্থ এলাকায় স্থায়ী শাসন ও প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করে দক্ষ শাসক হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। জনকল্যাণমুখী ও প্রজাপালনকামী প্রশাসন ও রাজনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল মোগল শাসনের মূল লক্ষ্য।

মধ্য এশিয়ার মহিলারা অনেক আগে থেকেই যুদ্ধ ও রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। তারা পুরুষদের সাথে যুদ্ধের মাঠে যেত, যোদ্ধাদের দেখাশুনা করতো এবং কতক সময় তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো। তৈমুরের সৈন্যদলে অনেক অদম্য ও সাহসী নারী যোদ্ধা ছিল। তারা ধনুক, বল্লম ও তরবারী চালনায় দক্ষ ছিল। যখন তাদের সরদারের মৃত্যু হত, তার বিধবা পত্নী স্বামীর সকল অধিকার ভোগ করত। তৈমুর ও চেঙ্গিস খানের পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী মোগল নারীরা রাজনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতেন।[২] মোগল হারেমের মহীয়সীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ সময়ের রাজনৈতিক গতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। মূলত মোগল সাম্রাজ্যের সূচনালগ্ন থেকেই মহীয়সী নারীরাও প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

আইসান দৌলত বেগম

আইসান দৌলত বেগম বাবরের নানী, ইউনুস খানের স্ত্রী। তিনি ছিলেন সাঘারিচি তুমান বেগের কন্যা। আইসান দৌলত বেগমকে বিবাহ করায় সাঘারিচি তুমান বেগ ইউনুস খানকে সম্মানিত ও খান উপাধী প্রদান করেন। আইসান দৌলত বেগম যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নাছোর বান্দী, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী ছিলেন। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে ওমর শেখ মির্জার মৃত্যুর পর মাত্র এগার বছর বয়স্ক বালক বাবর সিংহাসনে বসেন। এ সময় তিনি পরিবারের শত্রুর দ্বারা তাকে পরিবেষ্টিত দেখতে পান। তাকে যখন তার পিতার রাজ্য ফারগানা হতে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করা হয় ঠিক সেই সময় আইসান দৌলত বেগম দৃঢ়ভাবে তার নাতীর পাশে দাঁড়ান। অনেক রাজনৈতিক সংকট সমাধানে তিনি তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেন। রাজ্যের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বাবর সর্বদা তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৩]

১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে যখন হাসান-ই-ইয়াকুব বাবরকে সিংহাসনচ্যুত এবং তার ছোট ভাই জাহাঙ্গীরকে সিংহাসনে আসীন করার পরিকল্পনা করেছিল তখন বাবর রাজনৈতিক সমস্যায় পতিত হন। আইসান দৌলত বেগম তার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হাসান-ই-ইয়াকুব ও তার সমর্থনকারীকে গ্রেফতার করার জন্য কিছু বিশ্বস্ত লোকসহ বাবরকে তিনি দূর্গের দিকে প্রেরণ করেন। ঐ দূর্গে পৌছে তারা জানতে পারেন যে হাসান বাজ পাখীর দ্বারা পাখি শিকারে গিয়েছেন। এই সুযোগে বাবর লোকজনসহ হাসানের সমর্থনকারীদের উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের বন্দী করেন। এইভাবে বাবর হাসানের অনিষ্ঠকর অভিসন্ধি হতে রক্ষা পান।[৪] আইসান দৌলত বেগম তার নাতীকে তৈমুর ও চেঙ্গিস খানের বিরচিত সামরিক গল্প শুনাতেন। তিনি সর্বপ্রথম বাবরকে বিদ্যা চর্চার সুযোগ করে দেন। তার তত্ত্বাবধানে বাবর অল্প কালের মধ্যে তুর্কি ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই জ্ঞান চর্চাই পরবর্তীকলে তাকে রাজনৈতিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করেছিল। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মহিলা।

কুতলুগ নিগার খানম

বাবরের জীবনে দ্বিতীয় মহিলা যিনি তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি ছিলেন তার মাতা কুতলুগ নিগার খানম। তিনি ছিলেন ইউনুস খান ও আইসান দৌলত বেগমের দ্বিতীয় কন্যা। কুতলুগ নিগার খানম ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন ও শিক্ষিত মহিলা। বাবরের কষ্টকর দিনগুলোতে আইসান দৌলতের ন্যায় তিনিও রাজ্যহারা পুত্রের সর্বক্ষণ সঙ্গী ছিলেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, বড় কষ্টের মধ্যেও তার মাতা তার সঙ্গী হতেন এবং পুত্রের খাতিরে কষ্ট স্বীকার করতেন।[৫] কুতলুগ নিগার খানম বাবরের রাজ্যহারা অবস্থায় বড় কষ্টের দিনে তাকে সাহস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার

পরামর্শ দিতেন। তিনি পুত্রকে ভারত বিজয়ী হিসেবে দেখে যেতে পারেননি। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খানজাদা বেগম

সম্রাট বাবরের বড় বোন খানজাদা বেগম তার শাসনামলে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে বাবর শায়বানী খানের নিকট পরাজিত হয়ে সমরকন্দ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৬] এসময় তার বড় বোন খানজাদা বেগমকে শায়বানী খানের সাথে বিবাহ দিয়ে তার হারানো রাজ্য ফিরে পেতে চেয়েছিলেন।[৭] বাবর তার আত্মজীবনীতে বলেন, যখন তিনি মধ্যরাতে শাইখজাদা গেট দিয় সমরকন্দ শহর ত্যাগ করছিলেন তখন তার বড় বোন খানজাদা বেগম শায়বানী খানের হাতে ধরা পড়েন।[৮] বাবর ভেবেছিলেন যদিও তাকে সমরকন্দ ত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু তার পিতার রাজ্য ফরগনা ফিরে পেতে শায়বানী খান তাকে সাহায্য করবে। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আরচিয়ানের যুদ্ধে বাবর শায়রানী খানের নিকট চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়ে সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত হন। ফরগনাও এ সময় তার হাতছাড়া হয়। বাবর ভবঘুরের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরতে থাকেন। এই ঘটনার পর বাবর ভারতবর্ষের দিকে নজর দেন। খানজাদা বেগম পরবর্তীতে শায়বানী খান কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হন। তিনি তাকে সন্দেহ করেছিলেন যে, তার ভাই বাবরের সাথে তার যোগসূত্র আছে।[৯] খানজাদা বেগম কিছুদিন পর সৈয়দ হাদীকে বিবাহ করেন। মার্ভের যুদ্ধে সৈয়দ হাদীর মৃত্যুর পর পারস্যদের হাতে তিনি ধৃত হন। পারস্যে বন্দী অবস্থায় বাবরের বোন হিসেবে যখন তারা জানতে পারেন তখন শাহ ইসমাঈল সাফা তাকে মুক্তি দেন এবং মহান হিসেবে সম্মানিত হন। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট তাকে বাবরের নিকট ভৃত্য ও সম্পদসহ খ্যাতি ও বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ফেরত পাঠান। এসময় তার বয়স ছিল ৩৮ বৎসর।

শাহ ইসমাঈল উজবেগদের দমনের জন্য বাবরের সাহায্য চেয়েছিলেন। অপর পক্ষে বাবর তার বন্ধুত্বের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তার পূর্বপুরুষের রাজ্য উদ্ধারের জন্য শাহের সহযোগীতা চেয়েছিলেন। খানজাদা বেগম এই ঘটনায় খ্যাতির রাজদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন; তিনি বাবর ও পারস্যের শাহের মধ্যে কূটনৈতিক বন্ধন শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিলেন।[১০] এইভাবে খানজাদা বেগম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

খানজাদা বেগম হুমায়নের সময়ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাবরের সময়ে থেকেই তিনি রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। বাবরের প্রধান স্ত্রী মাহম বেগমের মৃত্যুর পর খানজাদা বেগমকে 'বাদশা বেগম' উপাধী দেওয়া হয়। হুমায়ুনের সময় তিনি রাজকীয় হারেমে প্রধান মহিলার মর্যাদা লাভ

করেন। তার প্রতি হুমায়ুনের বড় শ্রদ্ধা ছিল এবং তার সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। খানজাদা বেগম তার জীবনের শেষ বার বছর হারেমের প্রধান মহীয়সী হিসেবে সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে জড়িত ছিলেন।[১১] হুমায়নের সময় খানজাদা বেগম রাজনীতিতে খ্যাতির রাজদূত এবং শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। খানজাদা বেগম হুমায়ন ও তার ভ্রাতাদের যথা-হিন্দাল, কামরান ও আশকারীর মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তি ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। বাবরের মৃত্যুর পর তার পুত্রদের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। সে সময় হুমায়ন তার ফুফু খানজাদা বেগমের পরামর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খানজাদা বেগমের হস্তক্ষেপেই তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধের মিমাংসা হয়।[১২]

১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দাল কান্দাহারের শাসনকর্তা কেরাছা খানের অনুরোধে কান্দাহার দখল করেন। কামরান কান্দাহার উদ্ধারের জন্য তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। হুমায়ন এ খবর জানতে পেরে খানজাদা বেগমকে কান্দাহার গিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করতে বলেন। খানজাদা বেগম কান্দাহারে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি।[১৩] হুমায়ন বিভিন্ন সময়ে তার ভাই কামরান ও আশকারীর দ্বারা নানামুখী বাঁধার সম্মূখীন হন। খানজাদা বেগম হুমায়নের সে সব অসুবিধা মধ্যস্ততার চেষ্টা করেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন পারস্য থেকে ফেরার পথে কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেন। হুমায়নের বাহিনীকে আশকারী মোকাবেলা করতে না পাড়ায় কান্দার দূর্গ হুমায়ন জয় করেন। অতঃপর কামরানের উপদেশ অনুসারে আসকারী হুমায়নের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপনের জন্য খানজাদা বেগমকে প্রেরণ করেন। হুমায়ন খানজাদার অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি কারণ হুমায়ন তাদের প্রতি খুবই রাগান্বিত ছিলেন।[১৪] গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পর ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে খানজাদা বেগমের মৃত্যু পর্যন্ত এই ঘটনার সমাধান হয়নি। যদিও খানজাদা বেগমের প্রচেষ্টায় হুমায়ন ও তার ভাইদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ নিস্পত্তিতে সাফল্য লাভ করেনি, তবুও তিনি মিত্রতা ও শান্তি স্থাপনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই মহীয়সী মারা যান।

মাহম বেগম

১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর মাহম বেগমকে বিবাহ করেন। মাহম বেগম পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ের সুলতান হুসাইন পরিবারের মেয়ে ছিলেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বাবরের রাজনৈতিক জীবনে এই সম্পর্ক তাকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। হারানো রাজ্য পুনঃউদ্ধার ও রাজনৈতিক শক্তি লাভে মাহম বেগম বাবরকে সবচেয়ে বেশী সহযোগীতা করেন। তার প্রভাবের কারণে শিয়া সম্প্রদায় সংকটকালে বাবরকে সার্বিক সাহায্য করেন। বাবর ভারত বর্ষের সম্রাট

হওয়ার পর মাহম বেগমই প্রথম সম্রাজ্ঞী যিনি সিংহাসনে সম্রাটের পাশে বসার সম্মান লাভ করেছিলেন।[১৫]

সম্রাট হুমায়নের শাসন কালে তার মা মাহম বেগমের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অত্যধিক। মাহম বেগম হুমায়নের রাজ অভিষেক উপলক্ষে সম্রাটকে কারুকার্য খচিত সিংহাসন উপহার দেন। গুলবদন বেগম তার লেখা হুমায়ননামায় বলেন, আমার মাতা মাহম বেগম এক আনন্দ উৎসব ও ভোজ সভার আয়োজন করেন। এ উপলক্ষে নগরের সর্বত্র আলোক মালায় সু-সজ্জিত করা হয়। এই দিনে আমার আম্মা বিশেষ পদস্থ সামরিক ও সৈন্যদের নামে নির্দেশ জারি করেন যে, এ উপলক্ষ্যে তারাও যেন নিজেদের আবাসিক এলাকায় আলোক মালায় সু-সজ্জিত করেন। ঐ দিন থেকেই এ ধরনের রীতি ভারতে চালু হয়।[১৬]

বিবি মুবারিকা

বাবর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী বিবি মুবারিকা আফগানকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের ইউসুফ জাই সম্প্রদায়ের প্রধান শাহ মুনসুর ইউসুফ জায়ের কন্যা। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণ ছিল ইউসুফ জাই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। তাদের সাহায্যে বাবর আফগানিস্তানে তার অবস্থান শক্তিশালী করেছিলেন।[১৭] বিবি মুবারিকা ছিলেন বাবরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রী। কিন্তু তিনি তাকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারেননি। গুলবদন বেগম ভালবাসার ছলে তাকে আফগান আগাছা বলে ডাকতেন। বিবি মুবারিকার ভাইদের মধ্যে এক ভাই মীর জামাল ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবরের সাথে ভারতবর্ষের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং হুমায়ন ও আকবরের অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিবি মুবারিকা আকবরের রাজত্বের সময় মৃত্যুবরণ করেন।

গুলবদন বেগম

মোগল হারেমের আরো একজন অন্যতম প্রভাবশালী নারী। হুমায়ন বৈমাত্রেয় সর্ব কনিষ্ঠ বোন গুলবদনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গুলবদনও হুমায়নের পার্শ্বে সব সময় ছায়ার মত থাকতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নারী। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে তার থেকে হুমায়ন পরামর্শ ও সহযোগীতা নিতেন। রাষ্ট্রীয় সংকট ও রাজনৈতিক নানা পরিস্থিতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।[১৮]

হামিদা বানু

সম্রাট হুমায়নের স্ত্রী হামিদা বানু বেগম ছিলেন মোগল হারেমের আরো এক প্রভাবশালী নারী। তিনি ছিলেন আকবরের মা। প্রখর মেধা সম্পন্ন, অনন্য প্রতিভার অধিকারিনী এ নারী হুমায়নের রাজত্বকালে ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৫৪১

খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন তাকে বিবাহ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ১৪ বছর। তার বাবা ছিলেন মীর বাবা দোস্ত (ওরফে মীর আলী আকবর জামী)। তিনি ছিলেন পারস্যের শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। প্রথমে হামিদা বানু সম্রাট হুমায়নকে বিবাহ করতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলতেন, আমি এমন এক পুরুষকে বিয়ে করব যাকে সহজেই আমার আয়ত্তে পাব। যাকে আমি কাছে পাবনা, যার দর্শন লাভ করার জন্য আমাকে রীতিমত সাধনা করতে হবে, সে মানুষকে আমি কেন বিয়ে করব? অবশেষে ৪০ দিন নানা যুক্তি-তর্কের পর তিনি হুমায়নকে বিবাহ করতে সম্মত হন।[১৯] এই বিবাহ রাজনৈতিক ভাবে হুমায়নকে অনেক সুবিধা প্রদান করেছিল। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে হামিদা বানু হুমায়নকে উৎসাহ ও ব্যাপক সাহায্য করেন। তার মধ্যস্থতায় পারস্যের সাফাভী শাসক শাহ থামাসপ হুমায়নের হারানো রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করেন। তার দক্ষতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কারণে হুমায়ন রাজনৈতিক বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[২০] হুমায়নের সাথে তার বিবাহের পর হামিদা বানু বেগম স্বামীর সাথে থাকতেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন কৌণজের যুদ্ধে শেরশাহ এর নিকট পরাজিত হয়ে রাজ্য হারা হন। হুমায়ন রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য পারস্যের পথে যাত্রা করেন। এ সময় হামিদা বানু সন্তান সম্ভবা ছিলেন। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ অক্টোবর হামিদা বানু অমরকোটের একটি দূর্গে পুত্র আকবরকে প্রসব করেন। শিশুপুত্র আকবর কে রেখে পারস্যে চলে যান। এ সময় আকবর ধাত্রীদের কাছে লালিত পালিত হন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন আবার রাজ্য পূনরুদ্ধার করেন। ৩ বছর পর তিনি পুত্র আকবরের সাথে পুনর্মিলিত হন। তখন হতে সর্বদা তিনি হুমায়নের সাথে থাকতেন এবং সমসাময়িক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ চালিয়ে যেতেন। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে ৭৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আকবরের মাতা হিসেবে হামিদা বানু ভারতের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মাহম আনগা

মাহম আনাগা ছিলেন আকবরের অন্যতম ধাত্রী। তুর্কি শব্দ আনগার অর্থ ধাত্রী। শিশুকালে আকবরের দেখাশুনার জন্য ১০ জন ধাত্রী ভার নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে জিজি আনগা ও মাহম আনগা অন্যতম।[২১] মাহম আনগা ছিলেন নাদিম খান কোকার স্ত্রী। তার দুই পুত্রের নাম বাকী কোকো ও আদম কোকো। আদম কোকো আদম খান নামে ইতিহাসে পরিচিত। মাহম আনাগা ছিলেন আকবরের প্রধান সেবিকা। শিশুকালে আনগা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আকবরকে প্রতিপালন করেছেন। মাহম তাকে মাতার ন্যায় যত্ন করতেন। সম্রাট আকবরের সময়কালে মাহম আনগা রাজনীতিতে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আকবরের রাজত্বের সূচনাকালে রাজনীতিতে তার ভূমিকা ঝড় তুলেছিল। জিজি আনগা প্রকৃতপক্ষে আকবরকে স্তন্য দান করেছিলেন। তার স্বামী শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়নের খুবই বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন

শের শাহের নিকট পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় নদীতে ডুবে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। সে সময় তিনি তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।[২২] আকবরের মাতা হামিদা বানু ও বিমাতা হাজী বেগম মাহম আনগার প্রতি খুবই আস্থাশীল ছিলেন। আকবরও তাকে ভালবাসতেন এবং খুবই বিশ্বাস করতেন। মাহম আনগার প্রতি সবার ভালবাসাই ছিল তার মূলধন।[২৩]

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন আকস্মিক ভাবে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। আকবর ভারতের মোগল বংশের পরবর্তী সম্রাট হন। আকবরের অভিভাবক হন মোগল রাজ পরিবারের অন্যতম সুহৃদ বৈরাম খান। বৈরাম খান বাবর ও হুমায়ুনের অধীনে বিশ্বস্ত ভাবে চাকুরী করেন। যুবক আকবরের পক্ষে তিনি রাজ্য শাসন শুরু করেন। আকবর বৈরাম খানের উপর নির্ভর করতেন; শ্রদ্ধা করতেন ও প্রচুর বিশ্বাস করতেন। পরবর্তী কালে আকবরের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার ব্যাক্তিত্ব ও মানসিক বিকাশ ঘটে। এ সময় তিনি বৈরাম খানের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের হাতে শাসন ভার নেয়ার চিন্তা করেন।

মাহম আনগা রাজনৈতিকভাবে উচ্চভিলাসী ক্ষমতালোভী ছিলেন। তিনি আকবরের পিছন থেকে সাম্রাজ্য শাসনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে বড় বাধা ছিলেন বৈরাম খান। মাহম বৈরাম খানকে অপছন্দ করতেন। তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাহম সম্রাটকে বৈরাম খানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তার অনেক নিকট আত্মীয়কে আকবরের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেন। তার পুত্র বাকী কোকা আলীগড়ের শাসনকর্তা হন। অন্যপুত্র আদমখানও উচ্চপদ লাভ করেন। মাহম আনাগা ধীরে ধীরে রাজ্যের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দিল্লির গভর্নর শিহাব উদ্দিন খান ও খাজা হাসানের পরামর্শে মাহম বাহাদুর খানকে উকিল বা প্রধানমন্ত্রী করার চেষ্টা করেন।[২৪]

১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর আগ্রা হতে দিল্লিতে তার অসুস্থ মা হামিদা বানুকে দেখতে যান। আকবর দিল্লিতে আসলে স্বীয় মাতা হামিদা বানু ও পালক মাতা মাহম আনগা, দিল্লীর গভর্নর শিহাব উদ্দিন বৈরাম খানকে পদচ্যূত করার পরামর্শ দেন। সম্রাট তাকে পদচ্যূত করে মক্কায় হজ্জব্রত পালনের আদেশ পাঠান। এতে বৈরাম খান হতাশ হয়ে গুজরাটে চলে যান। সেখানে থেকে তিনি আরবে যাওয়ার ইচছা প্রকাশ করলেন, কিছু লোক তাকে বিদ্রোহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সম্রাট আকবর এই সংবাদ পেয়ে তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পীর মোহাম্মদ শেরওয়ানী বৈরাম খানকে গ্রেফতার করে সম্রাটের সামনে হাজির করেন। সম্রাট আকবর বৈরাম খানকে ক্ষমা করে দেন। বৈরাম খান মক্কায় হজ্বব্রত পালনের অনুমতি লাভ করেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খান মক্কা যাবার পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন।[২৫] বৈরাম খানের মৃত্যুর পর মাহম আনগা

প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[২৬] মাহম আনগা রাজদরবারে সম্রাট আকবরের সিংহাসনের পার্শ্বেই বসতেন। ১৫৬০ হতে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবর মাহম আনাগার প্রভাবাধীন ছিলেন। এ সময় আকবর নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। মাহম রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আকবরের শাসনকালের এ সময় কাল 'পেটিকোট গভর্নমেন্ট" নামে পরিচিত।[২৭] মাহম চেয়েছিল আকবর তার পুত্র আদম খানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু মাহমের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে মালওয়ার শাসনকর্তা রাজবাহাদুর বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে দমন করার জন্য মাহমের পুত্র আদম খানকে পাঠানো হয়। রাজবাহাদুর ছিলেন সমসাময়িক কালের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। তার রূপসী স্ত্রী রূপমতীর জন্য তিনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। আদম খানের নিকট রাজবাহাদুর পরাজিত হয়ে সারেংপুরের দিকে পালিয়ে যায়। তার সুন্দরী স্ত্রী রূপমতীসহ অনেক নর্তকী, গায়িকা ও অর্থ সম্পদ আদম খানের হস্তগত হয়। আদম খান সম্রাটের নিকট সকল অর্থ না পাঠিয়ে দু'জন সুন্দরী নর্তকীসহ কিছু অর্থ নিজের কাছে রেখে দেন। কৌশলে সুন্দরী রূপমতীকে ব্যবহার করতে চাইলে রূপমতী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। আকবর গুপ্তচর মারফত এ বিষয়ে অবহিত হয়ে নিজে দ্রুত সারেংপুরে যান। তিনি আদম খানের জানানা মহলে তল্লাশীর জন্য সৈন্য পাঠান। মাহম সংবাদ পেয়ে পরের দিন সেখানে পৌঁছেন এবং লুণ্ঠিত মালামাল সম্রাট আকবরের নিকট সমর্পন করেন। সম্রাট খুশী হয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন। আদম খান সব কিছু দেওয়ার পর দু'জন নর্তকীকে গোপনে রেখে দেন। সম্রাট এ সংবাদ পেয়ে মাহম আনগাকে দু'জন নর্তকীকে ফেরত পাঠাতে আদেশ করেন। মাহম আনগা ঐ দুই মহিলাকে না পাঠিয়ে হত্যা করেন। আকবর মাহম আনগা ও আদম খানের এই আচরনে খুবই রাগান্বিত হন। তিনি আদম খানকে অপসারণ করে পীর মোহাম্মদকে মালোয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ দেন।

১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে আকবর শামসুদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মাহম আনগা এবং তার পুত্র আদম খান সম্রাটের এই সিদ্ধান্তে চরম হতাশ ও ক্ষুদ্ধ হন। তার পতনের জন্য চক্রান্ত শুরু করেন। ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে আদম খান প্রধানমন্ত্রী শামসুদ্দিন আহমদকে দরবারে কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় হত্যা করেন। শোরগোল শুনে আকবর হারেম থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আদম খানকে হাতে নাতে ধরেন। আকবর অগ্নিশর্মা হয়ে আদম খানকে আক্রমণ করেন এবং ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন। আকবর নিজেই মাহমকে হত্যার সংবাদ দেন।[২৮] পুত্র মৃত্যুর শোকে মাহম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আদম খানের মৃত্যুর ৪০ দিন পর মাহম বেগমও মৃত্যু বরণ করেন। মা এবং পুত্রকে একই স্থানে দাফন করা হয়। আকবর মাহম বেগমের জানাজায় শরিক হন। এভাবে মাহম আনগার কবল থেকে আকবর মুক্ত হন।

মাহচুচাক বেগম

মাহচুচাক বেগম আকবরের শাসনকালর শুরুর দিকে রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সম্রাট আকবরকে তার রাজত্বের প্রথমদিকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন। ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন মাহচুচাক বেগমকে বিয়ে করেন। তিনি হুমায়নের সর্বকনিষ্ঠা বেগম। তার গর্ভে ৪ মেয়ে ২ ছেলে জন্ম গ্রহন করেন।[২৯] তিনি ছিলেন আকবরের সৎ মাতা। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ন যখন কাবুল হতে ভারতের দিকে যাত্রা করেন তখন মাহচুচাকের তিন বছর বয়স্ক পুত্র মীর্জা মুহাম্মদ হাকিমকে নাম মাত্র কাবুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে গভর্নর ছিলেন মুনিম খান। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর সিংহাসনে বসে তার নিয়োগ স্থায়ী করেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খান কাবুল হতে রাজ দরবারে আসেন এবং তার পুত্র গণিকে রেখে আসেন। মাহচুচাক চক্রান্ত করে গণি খানকে কাবুল হতে বিতারিত করেন। সম্রাট আকবর খবর পেয়ে মুনিম খানকে এক দল সৈন্য সহ তার বিরুদ্ধে পাঠান। জাললাবাদ অঞ্চলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং মুনিম খান পরাজিত হন। তিনি পুত্র মির্জা হাকিমকে নামে মাত্র গভর্নর করে নিজেই কাবুল শাসন করেন। এ সময় বিখ্যাত সৈয়দ তিরমীজ বংশের শাহ আবুল মালি মাহচুচক বেগোমের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। যিনি লাহোরের বন্দীখানা থেকে পলায়ন করে কাবুলে আসেন। মাহচুচাক বেগম তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং অল্প বয়স্কা কন্যা ফখরুন নিসাকে তার সাথে বিবাহ দেন। তিনি ছিলেন দুষ্ট প্রকৃতির। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে শাহ আবুল মালি মাহচুচাক বেগম ও তার উপদেষ্টাকে হত্যা করেন। মাহচুচাক বেগমের পুত্র মীর্জা হাকিম ও কন্যা ফখরুন নিসা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।[৩০] বদাখশানের শাসনকর্তা সোলায়মান মির্জার সহযোগিতায় মীর্জা হাকিম শাহ আবুল মালিকে পরাজিত ও হত্যা করে কাবুলের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করেন।

ফখরুন নিসা বেগম

আকবরের সময় আরও একজন নারী ফখরুন নিসা বেগম রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন হুমায়ন ও মাহচুচাক বেগমের কন্যা। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আকবরের সৎবোন। ফখরুন নিসা বেগম শাহ আবুল মালির মৃত্যুর পর বদাখশানের খাজা হাসান নক্সাবন্দীকে বিবাহ করেন। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ফখরুন নিসার ভাই মীর্জা মুহাম্মদ হাকিম আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কাবুল ও পাঞ্জাব দখলের চেষ্টা করেন। আকবর মীর্জা হাকিমের বিদ্রোহ মোকাবেলা করার জন্য নিজেই সৈন্যসহ কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। এ খবর শুনে মীর্জা হাকিম পলায়ন করেন। আকবর ফখরুন নিসা বেগমকে কাবুলের গভর্নর নিয়োগ করেন। ফখরুন নিসা ভাই মীর্জা হাকিমের ব্যাপারে আকবরের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করেন। অবশেষে আকবর তাকে ক্ষমা করে দেন।[৩১]

সেলিমা সুলতান বেগম

সম্রাট আকবরের শাসনামলে আরো একজন মহীয়সী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি হলেন বাবরের তৃতীয় স্ত্রী গুলরুখ বেগমের জ্যৈষ্ঠা কন্যা গুলগাদার বেগমের কন্যা সেলিমা সুলতান বেগম। গুলগাদার হুমায়নের সৎ বোন হলেও তার সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেলিমা আকবরের ফুফাতো বোন ছিলেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়নের আকস্মিক মৃত্যুর পর বালক আকবর সিংহাসন লাভ করেন। আকবরকে সহযোগিতা করেন হুমায়নের ঘনিষ্ট সহচর বৈরাম খান। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে জলন্ধর শহরে বৈরাম খানের সাথে সেলিমা সুলতান বেগমের বিবাহ হয়।[৩২] ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খান আকস্মিক ভাবে মারা যায়। কিছুদিন পর আকবর সেলিমা সুলতান বেগমকে বিবাহ করে মোগল হারেমে তোলেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর স্বীয় প্রতিভা বলে এই মহীয়সী আকবরের স্ত্রীদের মধ্যে "বাদশা বেগম" উপাধী লাভ করেন। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এলহাবাদে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। সে সময় সেলিমা সুলতান বেগম বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে সুকৌশলে সেলিমকে পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন।[৩৩] এই মহীয়সী নারী জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মৃত্যুর পূর্বেই আগ্রার নিকটবর্তী একটি উদ্যানে তিনি নিজের সমাধি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। তার তৈরী সমাধিসৌধে তাকে সমাহিত করা হয়।

নূরজাহান

ভারতবর্ষে মোগল ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহিলা ব্যক্তিত্বের অধিকারীনি ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সর্বশেষ স্ত্রী নূরজাহান। তার আসল নাম ছিল মেহের উন নিসা। তিনি পারস্যের মীর্জা গিয়াস বেগের কন্যা ছিলেন। ভাগ্যের অন্বেষণে মীর্জা গিয়াস পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্রাট আকবরের শাসনামলে মীর্জা গিয়াস বেগ মোগল প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে মেহের উন নিসার বিবাহের পর থেকে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। আলী কুলি বেগের সাথে মেহের উন নিসার প্রথম বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলার বর্ধমানের জায়গীরদার। মোগল রাজ দরবারের উদীয়মান পারস্য সৈনিক। তার গর্ভে লাডলী বেগম নামে এক কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে আলী কুলি বেগ বিদ্রোহ করলে জাহাঙ্গীর বাংলার শাসনকর্তা কুতুব উদ্দিনকে তার বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে আলী কুলি বেগ মারা যান। নূরজাহান স্বামী হারা হয়ে আগ্রাতে বাবার বাড়ীতে ফিরে আসেন। এ সময় আকবরের বিধবা স্ত্রী রোকাইয়া বেগমের অধীনে নূরজাহান হারেমে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে নওরোজ উৎসবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে তার

দেখা হয়। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জাহাঙ্গীর বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। নূরজাহান তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর মেহের উন নিসাকে 'নূরমহল' বা রাজ প্রসাদের আলো, পরে 'নূরজাহান' বা জগতের আলো উপাধি প্রদান করা হয়। নূরজাহান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে জাহাঙ্গীরকে পরামর্শ দিতেন। তার পরামর্শ সম্রাট গ্রহণ করতেন।

১৬১১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি সহ সর্ব ক্ষেত্রে নূরজাহান অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনি সম্রাটকে রাজকার্য পরিচালনায় পরামর্শ দিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ব্যাপকভাবে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, সমর কৌশলী হিসেবে ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার চালনা, বিচার কার্যের তদারকি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। সেলিমা সুলতান বেগমের মৃত্যুর পর ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহিলা 'বাদশা বেগমের' মর্যাদা লাভ করেন।[৩৪] নূরজাহান শুধু নিজেই ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেননি। তিনি তার পুরো পরিবারকেই মোগল প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীরের সাথে বিবাহের পরপরই নূরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যগণের সম্মান, ক্ষমতা ও প্রভাব মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নূরজাহান বিবাহে দুটি শর্ত দেন। প্রথমতঃ তার পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা উচিত; দ্বিতীয়তঃ তার ভাই রাজদরবারের প্রধান সেনাপতির পদ পাওয়া উচিত। জাহাঙ্গীর তার কথামত মীর্জা গিয়াস বেগকে ইতিমাদ-উ-দৌলা বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নূরজাহানের ভাই আবুল হোসেনকে ইতিকাদ খান পরে আসফ খান বা প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। নূরজাহানের মাতা আসমত বেগমকেও হারেমের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দারোগা পদে অধিষ্ঠিত করেন।[৩৫]

১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানুর সাথে জাহাঙ্গীরের পুত্র খুররমের বিবাহ হয়। শাহজাদা খুররম (শাহজাহান) আরজুমান্দ বানুকে ভালবেসে বিবাহ করেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের বিবাহের বাগদান অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬] এ বিবাহ যদিও নূরজাহানের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল কিন্তু এতে নূরজাহান সন্তুষ্ট হতে পারেননি। নূরজাহান তার কন্যা লাডলী বেগমকে শাহজাদা খুররুমের সাথে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। নূরজাহান তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের উপর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সে ইচ্ছে পূরণ হয়নি। কারণ খুররম আরজুমান্দ বানুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এরপর নূরজাহান শাহজাদা খসরুর সাথে লাডলী

বেগমের বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেন। খসরু ছিলেন মোগল সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। হারেমের মহিলা,অভিজাত সম্প্রদায়সহ সবার নিকট শাহজাদা খসরু খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এমন কি আকবরও শাহজাদা সশরুকে তার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন।

১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে কারাবন্দী করেন। নূরজাহান মনে করতেন শাহজাদা খসরু পরবর্তী সম্রাট হিসাবে অবশ্যই জাহাঙ্গীরের উপর কৃতকার্য হবেন। সুতরাং তিনি তার অবস্থা দৃঢ়করণের জন্য তার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি খসরুকে তার কন্যা লাডলী বেগমকে বিবাহ করে কারাবন্দী শোচনীয় অবস্থা হতে মুক্তিলাভের প্রস্তাব দেন। খসরু তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। খসরু ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা; তিনি নূরজাহানের প্রস্তাবের চেয়ে তার কারাবন্দী জীবনকেই বেছে নেন। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে খসরুকে নিরাপদে রাখার জন্য আসফ খানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে খসরু মুক্ত হন এর দুই বছর পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নূরজাহান অবশেষে শাহরিয়ারের সাথে লাডলী বেগমকে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শাহরিয়ার ভবিষ্যতে মোগল সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তার মধ্যে সম্রাট হওয়ার সকল গুণাবলীর অভাব ছিল। তারপরেও নূরজাহান কন্যা লাডলী বেগমের জন্য স্বামী হিসাবে শাহরিয়ারকে ঠিক করেন। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে শাহরিয়ারের সাথে লাডলী বেগমের বাগদান হয় এবং পরের বছর এপ্রিল মাসে জাঁকজমকের সাথে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।[৩৭]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর নূরজহানের প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, জাহাঙ্গীরের স্বর্ণ মুদ্রায় সম্রাটের নামের পাশাপাশি তার নামও অংকিত হত। মুসলিম ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল প্রথম। এ সব সোনার মুদ্রায় রাশিচক্রের ১২টি স্বাক্ষরের ছাপ থাকতো। মোগল ইতিহাসে মাত্র চারজন নারী রাজকীয় ফরমান জারির অধিকার পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে নূরজাহান অন্যতম। নূরজাহান ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ফরমানগুলি জারি করেন। এইসব ফরমানে ভূমি মঞ্জুর, প্রশাসনিক নির্দেশসহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশনা ছিল। এ সময় জাহাঙ্গীর নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নূরজাহানই সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন। একটি ফরমানে তিনি নিজেকে সম্রাজ্ঞী রুপে দাবী করেছেন; অন্য ফরমানে তার উপাধি রাজ মহিষী হিসেবে উল্লেখ আছে।[৩৮]

১৬২২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাহ আব্বাস কান্দাহার অধিকার করেন। নূরজাহান কান্দাহার থেকে শাহকে বিতাড়িত করার জন্য খুররমকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নূরজাহান চেয়েছিলেন খুররমকে কান্দাহারে পাঠিয়ে শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন। খুররম কান্দাহার যেতে অস্বীকার করেন। তিনি বুঝতে

পারেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এসময় নূরজাহানের পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ এবং তার স্ত্রী আসমত বানু মৃত্যুবরণ করেন। জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। নূরজাহান জামাতা শাহরিয়ারকে দিল্লির সিংহাসনে বসানোর জোর চেষ্টা চালান। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৩৯]

১৬২২ খ্রিস্টাব্দে খুররম (শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর তাকে একটি রাজকীয় ফরমান পাঠান তাতে বিদ্রোহের পথ পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু খুররম তা মানতে অস্বীকার করেন। খুররম ফতেপুর পৌছেন। তাকে বৈরাম খানের পুত্র খান-ই-খানান মির্জা আব্দুর রহিম খান এবং অনেক আমীর সহযোগিতা করেন। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে নূরজাহান তাকে দমন করার জন্য এক বাহিনী পাঠান। খুররম পরাজিত হন এবং দিল্লীর দক্ষিণে মালওয়াতে পালিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি দাক্ষিণাত্যের আমীর মালিক অম্বরের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দাক্ষিণাত্য থেকে খুররম বাংলা ও বিহারে আসেন। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে রোটাস ও আসিরগড় দূর্গ অধিকার করেন। খুররমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নূরজাহান মহব্বত খানের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে খুররম দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। তাকে দমন করার জন্য এবার মহব্বত খান ও রাজপুত্র পারভেজকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। খুররম তাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে পিতার নিকট ক্ষমা চেয়ে পত্র লেখেন। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চে জাহাঙ্গীর খুররমকে রোটাস ও আসিরগড় দূর্গে আত্মসমর্পন করতে বলেন। খুররম সব শর্ত মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এইভাবে খুররমের বিদ্রোহ শেষ হয়।

এরপর নূরজাহান মহব্বত খানের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। মহব্বত খান ছিলেন উচ্চভিলাসী ও দক্ষ সেনাপ্রধান। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে খুররমের বিদ্রোহ দমন শেষে মহব্বত খান ও শাহজাদা পারভেজ সারাংপুরের নিকট তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এসময় নূরজাহানের পরামর্শে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় বদলীর আদেশ দেন। মহব্বত খান রাজকীয় নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। শাহজাদা পারভেজ মহব্বত খানকে বাংলায় যেতে নিষেধ করেন। এরপর কঠোর ভাষায় দ্বিতীয় রাজকীয় ফরমান শাহাজাদা পারভেজের নিকট প্রেরণ করা হয়। তারা উভয়ে এই আদেশ মেনে নেন। খুররমের বিদ্রোহের সময়ে বাংলা ও বিহারে রাজ্যের বাজেয়াপ্ত করা হাতি ও অর্থ সহ মহব্বত খানকে মোগল রাজদরবারে স্বশরীরে হাজির হতে নির্দেশে দেওয়া হয়। তার সাথে এই কঠোর আচরণে মহব্বত খান নূরজাহানের উপর খুবই ক্ষুদ্ধ হন। তিনি গভীরভাবে নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং বিদ্রোহ করেন। প্রায় পাঁচ শত রাজপুত সৈন্যসহ মহব্বত খান রাজকীয় দরবারের দিকে অগ্রসর হন।

১৬২৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কাবুল যাওয়ার পথে জাহাঙ্গীর ঝিলাম নদীর তীরে অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে তাবু স্থাপন করেন। এ সময় মহব্বত খান জাহাঙ্গীরকে বন্দী করেন। মহব্বত খান তাকে নিয়ে রাজ তাঁবুতে ফিরে আসেন। নূরজাহান পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ছদ্মবেশে নদী পার হয়ে পালিয়ে যান। নূরজাহান মহববত খানকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[৪০] তিনি মহব্বত খানের নিকট আত্ম সমর্পন করেন এবং তার স্বামীর সাথে জেলখানায় মিলিত হন। নূরজাহান মহববত খানের বন্দী দশা হতে মুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা করেন। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের পরামর্শ মোতাবেক মহব্বত খানের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলেন। মহব্বত খান বন্দী সম্রাট জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, শাহরিয়ারসহ কাবুল হতে লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নূরজাহান গোপনে মহববত খানের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করে মোকাবেলার প্রস্তুতি নেন। মহব্বত খান এ খবর জানতে পেয়ে পরিস্থিতি বুঝে পালিয়ে যান। আসফ খান তার পুত্র আবু তালেব এবং দানিয়ালের পুত্র তাহমুরাস ও লস্করীকে তিনি বন্দী করে সাথে নিয়ে যান। নূরজাহান আফজাল খানের মাধ্যমে মহব্বত খানের নিকট আসফ খান তার পুত্র দানিয়ালের পুত্রকে মুক্তির জন্য নির্দেশ দেন। আরও বলা হয় যদি তিনি আসফ খানকে শীঘ্রই মুক্তি না দেন তাহলে একদল সৈন্য তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে। মহব্বত খান দানিয়ালের পুত্রকে মুক্তি দেন কিন্তু আসফখান ও তার পুত্র আবু তালেবকে রেখে দেন। নূরজাহান পুনরায় মহব্বত খানের নিকট সতর্কপত্র প্রেরণ করেন। তিনি তার নিকট হতে বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা পাওয়ার পর আসফ খানকে মুক্তি দেন। আবু তালেব তার অধীনেই থাকেন যিনি পরে মুক্তি লাভ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান লাহোরে পৌছে প্রশাসনকে পুর্নগঠন করেন এবং আসফ খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এদিকে মহব্বত খান শাহজাদা খসরুর সাথে হাত মিলান। তিনি খসরুকে রাজকীয় বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ দিয়ে শাহজাদা খসরুকে নূরজাহানের বিরুদ্ধে পাঠান। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে জাহাঙ্গীর কাশ্মীর হতে লাহোর ফেরার পথে মৃত্যুবরণ করেন। এতে নূরজাহানের রাজনৈতিক উচ্চাকাংখার পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও তিনি শাহরিয়ারকে পরবর্তী মোঘল সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আসফ খান প্রকাশ্যভাবে তার জামাতা শাহজাদা খসরুকে সমর্থন করেন। শাহরিয়ার ও নূরজাহানকে বন্দী করে জেলখানায় রাখা হয়। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা খসরু আগ্রাতে পৌছে শিহাব উদ্দিন মোহাম্মদ শাহজাহান নাম ধারণ করে মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[৪১] ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ ডিসেম্বর নূরজাহান মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দীর্ঘ ২০ বছর মৃত স্বামীর কবরের পার্শ্বে অবস্থান করেছিলেন।

মমতাজ মহল

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে আরজুমান্দ বানু সবচেয়ে বেশী রাজনৈতিক প্রভাবশালী নারী ছিলেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান তাকে বিবাহ করে মোগল হারেমে আনেন। মোগল হারেমে আসার পর আরজুমান্দ বানুকে "মমতাজ মহল" বা 'মমতাজ-ই-মহল' নামে ডাকা হত। তিনি ছিলেন আসফ খানের কন্যা। শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহল হয়ে ওঠেন তার রাজত্বের সর্বাপেক্ষা মর্যাদার অধিকারিনী। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করতেন সে সময় মমতাজ মহল ছিলেন তার নিত্য সহচর। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান সিংহাসন লাভের পর মমতাজ মহল হারেমের সর্বময় কর্ত্রী হন। তিনি মালিকা-ই-জাহান 'বাদশা বেগম' নানা উপাধিতে ভূষিত হন।[৪২] সম্রাট শাহজাহানের সকল রাজকীয় সীলমহর মমতাজ মহলের কাছে গচ্ছিত থাকতো। সকল রাষ্ট্রীয় দলিল ও ফরমান চুড়ান্ত হওয়ার পর সীল মহরের জন্য তার নিকট পাঠানো হত। ফলে সরকারী নির্দেশ জারির পূর্বেই তিনি তা জানতে পারতেন।[৪৩] গুজরাটের সুবেদার সাঈদ খান একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শাহজাহান তাকে মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দেন। মমতাজ মহলের অনুরোধে সম্রাট সে আদেশ প্রত্যাহার করেন।[৪৪]

মমতাজ মহল ফুফু নূরজাহানের মত ক্ষমতালোভী ও উচ্চভিলাষী ছিলেন না। তিনি রাজনীতির চাইতে ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন। অনেকটা অনিচ্ছা সত্বেও মতমতাজ মহল রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতেন। নিজের নামের ফরমান জারির ক্ষমতাও তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। শাহজাহান মমতাজ মহলকে খুবই ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। তার অকাল মৃত্যুতে শাহজাহান সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েন। মমতাজ মহলও স্বামীকে খুবই ভালবাসতেন। তার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য শাহজাহান আগ্রাতে সমাধি সৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন।

জাহান আরা

মোগল হারেমের আরো এক প্রভাবশালী নারী জাহান আরা। তিনি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মাতা আরজুমান্দ বানুর মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বৎসর। তিনি মাতার ন্যায় সুন্দর, শিক্ষিতা ও রুচি সম্পন্না ছিলেন। শাহজাহান তাকে গভীর ভালবাসতেন। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে জাহান আরা দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আগুনে পুড়ে যান। শাহজাহান তার বিছানার পার্শ্বে থেকে সর্বোত্তম চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। অবশেষে আরিফ নামে একজন ক্রীতদাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মলম দ্বারা তার পোড়া ক্ষত ভাল হয়। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে মাতার মৃত্যুর পর জাহান আরা হারেমের সর্বময় ক্ষমতা নিজ হাতে নেন। প্রথমে তিনি 'বেগম সাহিব' পরে সর্বোচ্চ

পদ মর্যাদা 'বাদশা বেগম' খেতাবে ভূষিত হন। তিনি হারেমের প্রশাসনিক রদবদল করে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী ৩০ বৎসর পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৪৫] রাজকীয় সীলমোহর তার কাছে থাকত। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্রসহ সকল বিষয়ে পিতার সাথে আলোচনা ও পরামর্শ দিতেন। জাহান আরা সম্রাটের দেখাশুনা ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আস্থা অর্জন করেন। জাহান আরার রাজনীতিতে ঝোক ছিলনা। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বের ঘটনার মোড় জাহান আরাকে রাজনীতিতে যুক্ত করতে বাধ্য করে। পিতার কল্যাণ এবং পরিবারের শান্তির ব্যাপারে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি শান্তি স্থাপনকারী হিসাবে পিতা ও তার ভ্রাতাদের মধ্যে পার্থক্য দূর করার জন্য চেষ্টা করেন। তার ভালবাসা ও দয়া রাজকীয় পরিবারে সকল প্রকার বিবাদ দূর করেছিল। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব পিতার নির্দেশ অমান্য করলে তার পদবী ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়। এ সময় জাহান আরার সুপারিশে আওরঙ্গজেব ক্ষমা লাভ করেন পদবী, দফতর ও মর্যাদা ফেরত পান।[৪৬]

১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের রাজ্য গোলকুন্ডের সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের সাথে শাহজাহানের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ছিলেন। তিনি গোলকুন্ডার শাসক আব্দুল্লাহ কুতুব শাহের উপর ক্রোধান্বিত ছিলেন, কারণ তিনি বকেয়া সহ কর সময় মত পরিশোধ করতেন না ও আওরঙ্গজেবের উজির মীর জুমলাকে আটক করেছিলেন। আওরঙ্গজেব গোলকুন্ডা অধিকার করে তাকে শাস্তি প্রদান করেন। আবদুল্লাহ কুতুবশাহ জাহান আরার নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। তার হস্তক্ষেপে আবদুল্লাহ মুক্তি পান।[৪৭]

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ হতে শাহজাহান অসুস্থ হতে শুরু করেন। তাঁর উচ্চাভিলাসী পুত্রগণ ক্ষমতা দখলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শাহজাহান তাঁর পুত্রদের উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। জাহান আরা তার সকল ভ্রাতার নিকট ঘটনা সম্পর্কে পৃথক পত্র প্রেরণ করেন যে শাহাজাহনের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল এবং তিনি এখনও রাষ্ট্রের কার্যে পুর্ণাঙ্গ ক্ষমতায় আছেন বাস্তবে শাহজাহান প্রশাসন চালানোর উপযুক্ত ছিলেন না। এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে জাহান আরা ভাইদের সৎ ও পক্ষপাতহীন পরামর্শ দেন। সকল ভাইয়ের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। ভাইদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

আওরঙ্গজেব মানসিকভাবে তার ভ্রাতাদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও ধর্মনিষ্ঠ সুন্নি মুসলমান। আওরঙ্গজেব নিজে সিংহাসন পাওয়ার জন্য মনকে সংগঠিত করেন। তিনি দারার বিরুদ্ধে হাত মিলানোর জন্য সুজা ও মুরাদের নিকট জরুরী বার্তা প্রেরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেব নিজকে দারার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করছিলেন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুজার সাথে দারার বিরুদ্ধে চুক্তি করেন এবং

তার পুত্র মুহাম্মদ সুলতান ও সুজার কন্যা গুলরুখ বানুর বাগদান অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরাধিকারী যুদ্ধের কারণে এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারেনি।

১৬৫৮ খিস্টাব্দে সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ রাজধানীতে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে সুজা পরাজিত হন। আওরঙ্গজেব মুরাদের সাথে মিলিত হন। কাশেম খানকে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যৌথবাহিনীর সাথে মোকাবেলার জন্য প্রেরন করেন। আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ধর্মমতের যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আওরঙ্গজেব উজ্জয়ীনির পথে গোয়ালিয়র পৌছেন। জাহান আরা আওরঙ্গজেবকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি তাকে পত্র লিখে দারাকে পরবর্তী মোগল সম্রাট হওয়ার সুযোগ দানের জন্য তাদের পিতার সাথে সাক্ষাত করতে বলেন। দারার সাথে তার সকল মতপার্থক্য সমাধান করতে বলেন। আওরঙ্গজেব তার এই প্রস্তাব অস্বীকার করেন এবং দারার পাপের তালিকা প্রস্তুত করতে বলেন।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সামুগড়ের যুদ্ধে সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হন এবং আত্মসমর্পন করেন। তাকে আগ্রার দূর্গে বন্দী করা হয়। জাহান আরা ব্যক্তিগতভাবে আওরঙ্গজেবের সাথে সাক্ষাত করে সাম্রাজ্য ভাগ করার প্রস্তাব দেন। শাহজাদা দারাকে পাঞ্জাব, সুজাকে বাংলা, মুরাদকে গুজরাট, আওরঙ্গজেবের জৈষ্ঠ্যপুত্র মুহাম্মদ সুলতানকে দাক্ষিনাত্যের শাসনকর্তা ও অবশিষ্ট মোগল সাম্রাজ্যের উপর আওরঙ্গজেবের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করেন। আওরঙ্গজেব তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি ভ্রাতাদের পরাজিত ও নিহত করে ময়ূর সিংহাসন দখল করেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান গৃহবন্দী অবস্থায় মারা যান।[৪৮]

ইতিহাসে জাহান আরাকে দারার পক্ষাবলম্বনের যে অভিযোগ করা হয় তা নিতান্ত অমূলক বলে মনে হয়। সকল ভাইদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কমতি ছিলনা। পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে হারেমের সকল কর্তৃত্ব দেন। জাহান আরা যে রাজকীয় বৃত্তি পেতেন আওরঙ্গজেব তা দ্বিগুণ করে বড় বোনের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দেন।[৪৯] তার প্রতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল বলেই তাকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা। পিতার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রীয় নানা বিষয়ে জাহান আরার সাথে আলোচনা করতেন এবং তার পরামর্শ নিতেন। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে জাহান আরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে 'সাহিবৎ-উজ-জামানি' উপাধি প্রদান করেন। তাকে দিল্লির শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এর সমাধি ভবনের প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাহিত করা হয়।

রওশন আরা

মোগল রাজনীতির এক আলোচিত চরিত্র রওশন আরা। সম্রাট শাহজাহান এ মমতাজমহলের দ্বিতীয় কন্যা রওশন আরা ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি শিক্ষয়িত্রী সিত্তিউন নিসার নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি বড় বোন জাহান আরার মত সুন্দরী বা বুদ্ধিমতী না হলেও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। রওশন আরা তুর্কি ভাষায় আগ্রহী ছিলেন। তার সাহিত্যকর্মের তেমন কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।[৫০] সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিয়েছিলেন। রওশন আরা প্রকাশ্যেই জাহান আরা ও দারাশিকোর বিরোধীতা করতেন। তিনি মোগল বংশের পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসেবে আওরঙ্গজেবের ধর্মপরায়ণতা ও যোগ্যতার কথা তুলে ধরেন।[৫১] মোগল অন্তপুরের গোপন পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের প্রত্যেকটি বিষয় তিনি আওরঙ্গজেবকে জানাতেন। এ সময় রওশন আরা তার নিজস্ব সংগ্রহের সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা আওরঙ্গজেবকে দান করেন। দারাশিকো গৃহযুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে রওশন আরা এক শাহী ভোজের ব্যস্থা করেন।[৫২] সম্রাট আওরঙ্গজেব ও নবনিযুক্ত আমীর ওমরাহ এ ভোজে উপস্থিত ছিলেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসন লাভ করার পর রওশন আরাকে 'শাহ বেগম' উপাধী এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা উপহার প্রদান করেন।

১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আওরঙ্গজেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রওশন আরা এ সময় সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিচালনা করেন। তিনি সম্রাটের অসুস্থতার খবরটি গোপন রাখেন। নয় বছর বয়সের শাহজাদা আজমের পক্ষে তিনি সকল প্রাদেশিক রাজা, সুবেদার ও সেনানায়কদের চিঠি লেখেন।[৫৩] সম্রাটের শয্যাপাশে তিনি কাউকে যেতে দিতেন না। শাহজাদা মোয়াজ্জেম তার এসব কার্যকলাপ মোটেই পছন্দ করতেন না এবং তাকে অবজ্ঞা করতেন। আরোগ্য লাভের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব রওশন আরার কর্মকান্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[৫৪] এই মহীয়সী নারী ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে চুয়ান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

জেব উন নিসা

মোগল হারেমের আরো এক হীরক খন্ড জেব উন নিসা। তিনি ছিলেন কবি, জ্ঞানী ও পন্ডিত। আওরঙ্গজেবের সময় এই শাহজাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতার পিয়তম সন্তান। এই কারণে আওরঙ্গজেবের নিকট হতে সকল জনগণকে ক্ষমা লাভে তিনি সাহায্য করতে পারতেন। উত্তরাধিকারী যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের শ্বশুর শাহ নাওয়াজ খান তাকে কোন প্রকার সাহায্য না করায় তিনি তাকে বন্দী করেন। জেব উন নিসা পিতার নিকট তার নানার ক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন; অবশেষে শাহ নাওয়াজ খান মুক্তিলাভ করেন।[৫৫] আওরঙ্গজেব জেব উন নিসাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি ছোট ভাই শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরকে সমর্থন

করতেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ আকবর আওরঙ্গজেবের সাথে রাজপুত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সঙ্গী ছিলেন। তিনি কু-উপদেষ্টার প্রভাবে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিজকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। জেবউন নিসা এ সময় পুরোপুরিভাবে তার ভাইকে সমর্থন করেন। তিনি গোপনে তার ভাইয়ের সাথে পত্র বিনিময় করতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব পুত্রকে দমন করেন। বিদ্রোহ দমনের পর জেব উন নিসার পত্রগুলি উদ্ধার হয়। এতে তিনি পিতার ক্রোধের স্বীকার হন। বার্ষিক চার লক্ষ টাকা ভাতা বন্ধসহ তার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেলিমগড় দূর্গে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। জেব উন নিসা জীবনের শেষ একুশ বছর বন্দী অবস্থায় ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।[৫৬]

সবশেষে বলা যায়, মোগল শাসনামল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মোগল নারীরা হারেমে অবস্থান করেও শাসক গোষ্ঠীর উপর যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে অবদান রেখে গেছেন তা প্রশংসনীয়। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সাহসী ভূমিকার কারণে মোগল প্রশাসন পেয়েছিল নতুন গতিধারা। মোগল যুগীয় রাজনীতিতে নারীদের মেধাদীপ্ত ভূমিকা মুসলিম নারীদের মেধা ও মননশীলতায় উৎসাহ সৃষ্টি করে আসছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল শাসনামল নারীদের ভূমিকার কারণে ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যপঞ্জী :

১. Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies and their Contribution*, p. 113.
২. মোঃ মহিবুল ইসলাম,মোঃআতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সী গণ', পৃ. ২৫৮।
৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬।
৪. জহীর উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা*, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৮।
৫. জহীর উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা*, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১২; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬।
৬. বাবর ছিলেন ফরগণার অধিপতি। ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাইমুরী শাসক বাইসানগারকে পরাজিত করে সমরকন্দ দখল করেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে উজবেক নেতা শায়বানী খান বাবরের নিকট হতে সমরকন্দ দখল করেন। বাবর ২ বছর পর ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আবার সমরকন্দ পুণরুদ্ধার করলেও পরের বছর তা হাত ছাড়া হয়।
৭. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ২।
৮. জহীর-উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা*, ১ম খন্ড, পৃ. ৯।
৯. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬।
১০. জহীর-উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৮।

১১. Rekha Misra, *Woman in Mughal India*, p. 20.
১২. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম,মো:আতিয়ার রহমনি, 'রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সী গণ', পৃ. ২৫৯।
১৩. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ৬৬-৬৭।
১৪. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৭।
১৫. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬।
১৬. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ২৯।
১৭. তদেব, পৃ. ৭।
১৮. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম,মো:আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সী গণ' পৃ. ২৬০।
১৯. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ৫৭।
২০. মোঃ মহিব্বুল ইসলাম,মো:আতিয়ার রহমান, 'রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সী গণ' পৃ. ২৬১।
২১. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৫৬।
২২. তদেব, পৃ. ৫৬।
২৩. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ১৬৬।
২৪. Abul-Fazl, *Akbar Nama*, vol. II, p. 149.
২৫. Abul-Fazl, *Akbar Nama*, vol. II, pp. 152-60.
২৬. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ১৬৬।
২৭. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ০৮।
২৮. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ১৬৬-১৬৯।
২৯. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ৮৯, Abul Fazl, *Akbar Nama*, Vol. II, p. 289.
৩০. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ১৬৯-৭০; Abul Fazl, *Akbar Nama*, Vol. II, p. 290-93.
৩১. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ. ১৭০-১৭১; Abul Fazl, *Akbar Nama*, Vol. II, p. 536; শাহরিয়ার ইকবাল,*মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*,পৃ. ৯।
৩২. গুলবদন বেগম, *হুমায়ন নামা*, পৃ : ১৬৪, শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬১-৬৫।
৩৩.Abul Fazl, *Akbar Nama* (tr) Vol. III, P. ১২২৩, মোঃ মহিব্বুল ইসলাম,মো: আতিয়ার রহমান,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
৩৪. Beni Prasad, *Histori of Jahangir*, (Allahabad: The Indian press, publication pvt. ltd. 1962) p. 169; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৬-৬৯।

৩৫. Beni Prasad, *Histori of Jahangir*, p. 189; K.S Lal, *The Mughal Harem* p. 79; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৬-৬৯।

৩৬. Nur-Ud-in Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangir*, Vol. I, pp. 224-225.

৩৭. Nur-Ud-Din Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangir* Vol. II, p. 203.; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ০৯।

৩৮. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, "শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ও রাজনীতিতে মুঘল নারী", *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ম সংখ্যা, ২০০২-০৩, পৃ. ৬৩, শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৬৯।

৩৯. Beni Prasad, *Histori of Jahangir*, p.: 342.

৪০. Beni Prasad, *Histori of Jahangir*, pp. 399-400. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ.০৯।

৪১. Beni Prasad, *Histori of Jahangir*, pp.354-55; Nur- ud-in Muhammad Jahangier, *Tuzuk-i-Jahangir* Vol. I, pp.277-80 ; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ.৭১-৭৩।

৪২. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, "শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ও রাজনীতিতে মুঘল নারী" পৃ. ৬৪।

৪৩. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India.* (Allahabad : Indian press, 1931) p. 342; Rekha,Misra, *Woman in Mughal India*, p. 39.

৪৪. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১০।

৪৫. K.S Lal, *The Mughal Harem*, p. 90.

৪৬. Jadunath Sarkar, *History of Aurangjib*, (Calcutta : orient Long man Ltd, 1973) Vol. I, p. 76; শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১০।

৪৭. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ১০।

৪৮. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৮৭-৮৮।

৪৯. শাহ আলম, মুঘল ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি ও ধারা, *(১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ) অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ৯০।

৫০. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯০।

৫১. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol. III, pp. 58-59.

৫২. Rekha Misra, *Women in Mughal India*, p. 47.

৫৩. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯২।

৫৪. J.N. Sarkar, *History of Aurangzib*, Vol. III, p. 59.

৫৫. Rekha,Misra, *Woman in Mughal India*, p. 50.

৫৬. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, পৃ. ৯৭-৯৮।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জোড়া করে বা নারী-পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[১] প্রাকৃতিক ভিন্নতা ছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। নারী কারো মা অথবা স্ত্রী অথবা মেয়ে অথবা বোন অথবা অন্য কোন আপনজন। নারী সর্বযুগেই সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ:) কে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করার পর তার বাম পাঁজরের হাড় হতে মা হাওয়া (আ:) কে সৃষ্টি করেন। তারা ছিলেন পৃথিবীর প্রথম নারী-পুরুষ। বেহেশতে বসবাসকালে মা হাওয়া বাবা আদমকে অনুসরণ করে চলতেন। বেহেশতে তারা ছিলেন এক অপরে পরিপূরক। তাদের দু'জনের মিলনে পৃথিবীতে শুরু হয় মানুষের বসবাস। মা হাওয়ার গর্ভে প্রত্যেকবার একজন ছেলে একজন মেয়ে জন্মলাভ করে। মহান আল্লাহ আদিকাল হতে এভাবেই নারী-পুরুষের মাধ্যমে পৃথিবীতে বংশ বিস্তারের ধারা চালু করেন। মানব জাতির এ ধারায় নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসে গড়ে উঠে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি।[২] নারী হয়ে উঠে মানবসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পৃথিবীর আদিকাল হতে নারী নানা কর্মকান্ডে পুরুষের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নারী তার স্বীয় মেধা, যোগ্যতা, প্রতিভা, পরামর্শ ও সহযোগীতা দিয়ে পুরুষকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছে সর্বকালে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রসহ সর্বত্র নারী পুরুষের পাশে থেকে সহযোগীতা ও প্রেরণা দিয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে নারী পুরুষ একই যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পরস্পর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে নারী-পুরুষের যৌথ চেষ্টায় নির্মিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাস।

ভারতের মোগলরা ছিল চাগতাই তুর্কি। সম্রাট বাবর ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের পিতা ছিলেন ওমর শেখ মীর্জা। তিনি ছিলেন তৈমুর লং এর বংশধর। মাতা কুতলুগ নিগার খানম ছিলেন বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর। দু'জন বীরের রক্ত বাবরের শরীরে ছিল বলে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী ও বীরযোদ্ধা। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে বাবর ফরগণার অধিপতি হন। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৈমুরদের রাজধানী সমরকন্দ দখল করেন। কিন্তু তিনি সমরকন্দে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এক সময় বাবর ফরগণা ও সমরকন্দ হারিয়ে ভবঘুরের জীবন যাপন করেন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাবুল জয় করেন এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর চূড়ান্তভাবে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশই মোগল নামে পরিচিত।

আরবি হারিম শব্দের তুর্কি রূপ হারেম অথবা (Harem) হারিম। আরবি হারিম শব্দের অর্থ পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। তুর্কি হারেম শব্দের অর্থ বাসগৃহ, অন্দরমহল, নারী নিবাস প্রভৃতি। মোগল শাসনামলে শাহী প্রাসাদের যে অংশে মেয়েদের আলাদা করে রাখা হতো তাকে হারেম বা হারিম বলা হতো। মুসলিম জগতে উমাইয়া আমল হতে হারেম প্রথার শুরু হলেও ভারতে মোগল শাসকরা এর কাঠামোগত রূপ দেন। সম্রাট বাবর ও হুমায়নের শাসনকালে হারেমের আকার ছোট ছিল। আকবরের সময় থেকে হারেমের আকার ও পরিধি বেড়ে যায়। মূলত তিনিই ছিলেন মোগল হারেমের জনক।

মোগল শাসনামলে মহীয়সী নারীরা অন্তপুরে বসবাস করতেন; যাকে হারেম, অন্দরমহল, মোগল জানানা মহল বলে অভিহিত করা হয়েছে। মোগল সম্রাটগণ বড় বড় দূর্গ নির্মাণ করেন। দূর্গের ভিতর রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক মহল নির্মাণ করেন। মহীয়সীদের বসবাসের জন্য এ সব সুন্দর মহলগুলোতে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ছিল। মহলে মোগল নারীরা অনেকাংশে আয়েশী জীবন যাপন করতেন। মহলগুলোর সাথে সু-সজ্জিত বাগান, ঝরণা, পুকুর ইত্যাদি সংযুক্ত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের জন্য হারেমে আলাদা আলাদা মহলও ছিল। বাসস্থান হিসেবে হারেমের মহলগুলো ছিল খুবই চাকচিক্যময়।

হারেমের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল সুদৃঢ়। সেখানে দু'ধরনের ব্যবস্থাপনা ছিল। আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন মহিলা। দারোগা, মহলদার, মুসরিফ, টহলদার ও বিজি প্রহরীরা মহলের ভিতর দেখাশুনা করতেন। তারা হারেমের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন কাজে তত্ত্বাবধান ও তদারক করতো। সবার দায়িত্ব কর্তব্য ভাগ করা ছিল। সুশৃংখলভাবে সবাই নিজ দায়িত্ব পালন করতো। মহলের বাহিরে খোঁজা প্রহরীরা পর্যায়ক্রমে পাহারা দিত। আর দুর্গের বাহিরে রাজপুত সৈন্য ও আমীরদের সৈন্যরা সর্বক্ষণ পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। সব মিলে হারেমের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ছিল খুবই নিয়মতান্ত্রিক।

মোগল হারেমে যারা বসবাস করতেন তারা হলেন সম্রাটগণের স্ত্রী, মাতা, সৎমাতা, পালকমাতা, খালা- ফুফু, কন্যা, বোন, দাদী-নানী ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয় স্বজনগণ। এছাড়াও সম্রাটগণের উপপত্নী, নর্তকী, গায়িকা, কৃতদাসী, মহিলাভৃত্যসহ বিপুল সংখ্যক মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরাপত্তা প্রহরী যারা হারেমের দেখভাল করার জন্য সর্বদা নিয়োজিত ছিল। আমীরগণের স্ত্রী এবং কিছু মহিলা যারা হারেমে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আসতেন; অনুষ্ঠান শেষে তারা আবার চলে যেতেন। হারেমে সেবাদানকারী এবং তদারকী কাজে নিয়োজিত কিছু মহিলা ও কাজ শেষে বাড়ি ফিরে যেতেন। মহীয়সী নারীদের নিকট হারেম সুন্দর বাসস্থান, নিরাপদ আশ্রয় ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গণ্য হতো। তাদের জীবন গঠন, কার্যাবলী, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্পকলার

চর্চা, রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সবই হারেমকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো। আবুল ফজল হারেমের অধিবাসীদের সংখ্যা পাঁচ হাজার বললেও প্রকৃত অর্থে তারা সবাই একসাথে হারেমে বসবাস করতেন না। হারেমের তত্ত্বাবধান, তদারক, নিরাপত্তা ও সেবাদানকারী মহিলাদের অধিকাংশই প্রতিদিন হারেমে আসতে এবং কাজ শেষে ফিরে যেত। সেই হিসেবে হারেমের নিয়মিত অধিবাসী সংখ্যা ছিল খুবই কম।

হারেমে মহীয়সী নারীদের জীবন সম্রাটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। সাধারণত মোগল সম্রাটগণের একাধিক স্ত্রী থাকত। ইসলামে প্রথাগতভাবে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে। মোগল সম্রাটগণ রাজনৈতিক ও তৈমুরীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতেন। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। আকবর ভারতে তার শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্কন্টক করার জন্য রাজপুত নারীদের বিবাহ করেন। জাহাঙ্গীরকেও রাজপুত নারীর সাথে বিবাহ দেন। এই বিবাহ ছিল চুক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। তারা উভয়ই একাধিক রাজপুত নারীকে বিবাহ করে মোগল হারেমে তোলেন। এ ছাড়াও মোগল সম্রাটগণ তুর্কি ও পারস্য শাসকদের অনুকরণে হারেমে দাস প্রথার আলোকে উপপত্নী রাখতেন। মোগল সম্রাটগণের স্ত্রীদের বেগম বলা হতো। সাধারণত সম্রাটগণের মাতা হতেন হারেমের প্রধান কর্ত্রী। তা ছাড়া সম্রাটগণের স্ত্রীদের মধ্যে যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ্যা এবং প্রতিভাময়ী তিনিই হতেন হারেমের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হতো 'বাদশা বেগম'। তার নির্দেশের আলোকেই হারেম পরিচালিত হতো। তাদের জীবন বড়ই সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে কেটে যেত।

সম্রাট আকবর প্রথম রাজপুত হিন্দু নারীকে বিবাহ করে হারেমে আনেন। তিনি পুত্র জাহাঙ্গীরকেও হিন্দু রাজপুত নারীদের সাথে বিবাহ দেন। এ সব রাজপুত নারীদের বায়াস বা মহল বলা হতো। মর্যাদাগত দিক থেকে তারা হারেমে সাধারণ স্ত্রী হিসেবে বসবাস করলেও অনেকে ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হারেমে হিন্দু রাজপুত স্ত্রীগণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। সেখানে তারা নিজ ধর্ম, পূজা- অর্চনা পালন করতেন। ধর্ম পালনে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের অনেকেই সম্রাটকে প্রথম পুত্র সন্তান উপহার দেয়ায় খুবই সম্মান ও মর্যাদার সাথে হারেমে বসবাস করতেন। হিন্দু রাজপুত নারীদের সাথে বিবাহের মাধ্যমে মোগল শাসন ব্যবস্থায় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মোগল হারেমে সম্রাটগণের মাতা, সৎমাতা ও পালকমাতাগণ খুবই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতো। মাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল মোগল ঐতিহ্যের অংশ। তাদের পারিবারিক বন্ধন ছিল খুবই শক্তিশালী। এছাড়াও তারা দাদী-নানী, খালা, ফুফু, বোনদেরকেও উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দিতেন। ঐতিহ্যগতভাবে সম্রাটের মাতা হারেমের

প্রধান হতেন। তাদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্রাটগণ তাদেরকে রাজকীয় উপাধীতে ভূষিত করতেন। পালকমাতা বা ধাত্রীগণও তাদের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সম্রাট আকবর মাহম আনগাকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। মোগল হারেমে কন্যা সন্তানের জন্ম কোন ঘৃণার বিষয় ছিলনা। তবে মোগল সম্রাটগণ প্রথম পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা করতেন। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে প্রথম পুত্র সন্তানই পরবর্তী উত্তরাধীকারী নির্বাচিত হতেন। তারা কন্যা শিশুদের শিক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কন্যা সন্তানদের প্রতি তাদের উদার মনোভাবের কারণে ইতিহাসখ্যাত গুলবদন বেগম, জাহান আরা, রওশন আরা, জেব উন নিসা, সিত্তিউন নিসার মত শাহজাদীদের মোগল ইতিহাসে অসামন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

হারেমের মহিলাদের কঠোর পর্দা প্রথা মেনে চলতে হতো। হিন্দু স্ত্রীগণও পর্দা প্রথা মেনে চলতেন। হারেমের ভিতর তারা সবাই ছিলেন মুক্ত স্বাধীন। সর্বত্র তারা চলাফেরা করতে পারতেন। বিশেষ প্রয়োজনে হারেমের মহিলারা ঘোমটা দিয়ে বাহিরে বের হতেন। যখন তারা ভ্রমণে বের হতেন তখন পর্দার সাথে থাকতেন যাতে বাহিরে কেউ তাদের দেখতে না পারে। হারেমে অনেক মহীয়সী ধর্মচর্চা করতেন। ইসলামের অনুশাসনগুলি তারা মেনে চলতেন। হারেমে শিশু বয়সে শাহজাদা ও শাহজাদীদের কুরআনের পাঠ শিক্ষা দেয়া হত। মোগল মহীয়সীদের মধ্যে গুলবদন বেগম, সেলিমা সুলতানসহ কয়েকজন হজব্রতও পালন করেন। জেব উন নিসা শৈশবকালেই কুরআন হেফজ করছিলেন। মোগল হারেমে মহীয়সীদের জীবনে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মোগল সম্রাটগণ হারেমে মহিলাদের আমোদ-প্রমোদন বিনোদন ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। হারেমের মহীয়সীরা অবসর সময়ে খেলাধুলা, সঙ্গীত বই পড়া ও নানা শিল্পকলার চর্চা করতেন। হারেমে সঙ্গীত, নৃত্য অনুষ্ঠান হতো। মহিলারা পর্দার আড়াল হতে তা উপভোগ করতেন। অবসর সময়ে তারা দাবা, চৌগান, লুকোচুরি নানা ধরনের খেলাধুলা করতেন। গল্প শোনা, গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাহিনী সম্বলিত বই পড়া, সাহিত্যচর্চা, কবিতা রচনা, ছবি আঁকা, হস্তশিল্প, শিকার করা প্রভৃতি ছিল মোগল মহীয়সী নারীদের প্রিয় কাজ। হারেমে নানা উৎসব যেমন নওরোজ, ঈদ উৎসব, শবেবরাত, কুরবানী, বিবাহ, অভিষেক, সম্রাটের জন্মদিন পালন করা হতো। মোগল মহিলারা এ সব উৎসবে অংশগ্রহণ করত। উৎসব উপলক্ষ্যে উপহার বিনিময় হতো। বিভিন্ন সময় নৃত্য-সঙ্গীতের আসর বসত। অনুষ্ঠান শেষে ভোজের ব্যবস্থা থাকতো। হারেমের আভ্যন্তরীণ জীবন ছিল স্বকীয় বিশ্বাসের আলোকে বিনোদনমূলক।

হারেমের মহিলারা সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করতেন। তাদের জীবন ছিল বিলাস ব্যাসনে ভরপুর। উৎকৃষ্টমানের রেশম, পশমী ও মখমলের কাপড় তারা

ব্যবহার করতেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিনকে তারা শবনম নামে জানত। সুন্দর কারুকার্য করা জামা তারা ব্যবহার করতেন। তারা নিজেরদেরকে বিভিন্ন অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করতেন। তারা মুক্তা, হীরা ও সোনার গহনা ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ও গৃহসজ্জার উপকরণাদিও ব্যবহার করতেন।

হারেমের মহীয়সীরা শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিতে বেশ উৎসাহী ছিলেন। তাদের অনেকে জ্ঞান চর্চা করতেন, কেউ শিক্ষায়তন ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। মোগল মহীয়সীগণ হারেমে কঠোর পর্দা প্রথার মধ্যে অবস্থান করেও কবিতা রচনা, সাহিত্য চর্চা, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মক্তব ও পাঠাগার গড়ে উঠে। নিজস্ব তহবিল হতে মহীয়সীগণ অর্থ খরচ করে দুর্লভ ও মূল্যবান বই সংগ্রহ করতেন। হারেমের মহীয়সীগণের অনেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্যোগে পড়াশুনা করতেন। সম্রাট বাবরও একজন জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় মহীয়সীগণের জ্ঞান চর্চার যে ধারা চালু হয় পরবর্তীতেও তা অব্যাহত ছিল।

মোগল হারেমের অনেক মহীয়সী অর্থনৈতিক কাজে আগ্রহী ছিলেন। তারা সমুদ্র পথে জাহাজ যোগে বাণিজ্য করতেন। এতে প্রচুর অর্থ লাভ হতো। এ ছাড়া তারা বাজার ও কারখানা নির্মাণ করে উৎপাদিত পণ্য কেনাবেচা করত। তাদের নিজস্ব জায়গীর ও প্রচুর সম্পদ ছিল। সে অর্থ তারা ব্যবসা বাণিজ্যে লাগিয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। মোগল নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ও স্বাধীন থাকায় অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত ছিলেন।

হারেমের মহীয়সীগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, স্মৃতিসৌধ, উদ্যান নির্মাণ করেন। এ সব জনহিতকর কাজে তারা বেশ উৎসাহী ছিলেন। গরীব, অনাথ ও দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা জন্য অর্থ সাহায্য, বিবাহের দেনমোহরানা প্রদানসহ নানাবিধ মানবিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তারা ব্যক্তিগত তহবিল হতে স্মৃতিস্তম্ভ, উদ্যান ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তাদের নির্মিত সরাইখানাগুলোতে পথিক, ব্যবসায়ীরা বিশ্রাম নিত। তাদের স্বামী বা পিতার নামে এসব স্মৃতি সৌধ, উদ্যান নির্মাণ করেন। কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর, আগ্রা ও দিল্লীতে তাদের এ স্মৃতি সৌধ, সরাইখানা ও উদ্যানগুলোকে দেখা যায়।

রাজনীতিতেও মোগল নারীরা আগ্রহী ছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাদের অনেকে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী ও ক্ষমতাবান হতে দেখা যায়। বাবরের সময় হতে মোগল নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও রাজনীতিতে ভূমিকা রাখেন। রাজনৈতিক বিরোধ মিমাংসা, শত্রুর সাথে শান্তি স্থাপন, ক্ষমতা লাভ, আপনজনকে নিরাপদ করতে সর্বোপরি তারা শান্তির দূত হিসেবে

রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতেন। মোগল রাজনৈতিক ইতিহাস- ঐতিহ্যের লালন, শৌর্য-বির্য্যের প্রতি তারা ছিলেন সংকল্পবদ্ধ ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। অনেক ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে মোগল সম্রাটগণের পাশে থেকে তারা রাজনীতিতে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন; যা মোগল ইতিহাসকে দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। যুগ যুগ ধরে এ সব মহীয়সীগণ মোগল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

মোগল শাসনামলে হারেমের মহীয়সীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন সামগ্রিকভাবে তা মোগল ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করেছে। মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেই সমাজে নারী নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকুলতার মাঝে বসবাস করতেন। সামাজিক কুসংস্কার, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, বহুবিবাহ, কঠিন পর্দাপ্রথা পালনসহ অনেক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নারীকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তবুও তারা নিজেদের মেধা, মননশীলতা ও যোগ্যতা দিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রে অনেক অবদান রেখে গেছেন। তারা সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবন যাপন, নিরাপত্তা লাভ, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনীতিতে সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও অর্জিত সম্পদে অধিকার লাভ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন মতামত প্রকাশ, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণসহ অনেক রাজনৈতিক ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন। তাই বলা যায়, মোগল নারীরা শুধুমাত্র হারেমের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেদের বিলাসিতার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম রাজনীতিসহ সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে মোগল প্রশাসনকে অর্থবহ করে তুলেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস*, কলিকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৯

অশোক মুখোপাধ্যায়, *সংসদ সমার্থশব্দকোষ*, কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮।

আব্দুর রহীম, *নারী*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮।

আব্দুল ওয়াহিদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি সাম্প্রাদায়িকতা ও মুসলমান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ২০০৫।

আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকাঃ বড়াল প্রকাশনী, ২০০৭।

আবু সুফয়ান যাকী, *ফরহাঙ্গে জাদীদ*, ঢাকাঃ রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮।

আবুয যোহা নুর আহমেদ,*মুসলিম জগতের মহীয়সী* নারী, ঢাকাঃ মুহাম্মদ ফারুক হোসেন, ১৯৬৬।

আবুল ফজল জামাল উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে মোকাররম, *লিসানুল আরা'ব*, লেবাননঃ দারুস ছদির, ১৯৬৫।

আবুল হাসান নদভী, *ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র*, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস*, ঢাকাঃ চয়নিকা প্রকাশ, ২০০৭।

আনিস সিদ্দিকী, *মোগল হারেমের অন্তরালে*, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৬৯।

আলী আসগর খান ও শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, ঢাকাঃ সুমন প্রকাশনী, ১৯৮০।

আনিস সিদ্দিকী, *সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫শ খণ্ড, ঢাকা-১৯৯৬।

ঈশ্বরী প্রসাদ, *মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস*, (আরশাদ আজিজ অনূদিত), ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, ২০০৩।

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল, *হোয়াইট মোগলস* (আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু অনূদিত) ঢাকাঃ ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৩।

উবায়দুর রহমান খান নদভী, *ইতিহাসের কান্না*, ঢাকাঃ সুগ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০১।

এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য*, ঢাকাঃ ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯০।

এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

এ কে এম ইয়াকুব আলী, রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, *মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা*, ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনী, ২০০৬।

এ কে. এম. শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), ঢাকাঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭।

এ বি এম হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা*, ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স, ২০০৪।

এ বি এম হোসেন, *আরব স্থাপত্য*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯।

এ বি এম হবিবুল্লাহ, *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, (লতিফুর রহমান অনূদিত) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

এ. কে. এম. আব্দুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল, *মুসলিম সভ্যতায় নারী*, খুলনাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

এম দেলওয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

এস, এম জাফর রশীদ ফারুকী, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা ১০০০-১৮০০*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

কাজী আবুল হোসেন, *আলমগীরের পত্রাবলী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

কাজী রফিকুল হক, *বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, কলকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৯।

কে. আলী, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮২।

কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮।

কে. এম. আশরাফ, *হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা*, কলকাতাঃ পাল পাবলিশার্স, ১৯৮০।

কামাল উদ্দিন হোসেন, *রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৮।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *মুসলিম বীর নারী*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

খাজা হাসান নিজামী, *মোগল শাহজাদিদের কান্না*, (আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অনূদিত) ঢাকাঃ ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৩।

গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, ঢাকাঃ মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০০৪।

গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *ইতিহাসের ইতিহাস*, ঢাকাঃ মদিনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪।

গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৭০।

গুলবদন বেগম, *হুমায়ননামা*, (মোস্তফা হারুন অনূদিত) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।
জওহর আফতাবচী, *তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত*, (সম্রাট হুমায়নের কাহিনী) (চৌধুরী শামসুর রহমান অনূদিত), ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ প্রকাশনী, ২০০২।
জয়তি জাফা, *নূরজাহান* (সৈয়দ হালিম অনূদিত) ঢাকাঃ ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৭।
জাহানারা রায় চৌধুরী, *মুঘল ভারতে নারী শিক্ষা*, কলকাতাঃ পাল পাবলিসার্স, ২০০১।
জহীর উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, *বাবুরনামা*, (প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ অনূদিত), ঢাকাঃ বাংলা একডেমী, ২০০৪।
জীতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, (এস. মুজিব উল্লাহ্ অনূদিত), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।
নিকোলাও মানুচি, *মানুচির চোখে মোগল ভারত (১৬৫৩-১৭০৮)* (আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অনূদিত), ঢাকাঃ ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৮।
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান*, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০১।
পুনেন্দ্র পত্রী, *সাহিত্যের তাজমল*, কলকাতাঃ পাল পাবলিসার্স, ১৯৮৪।
প্রভাতাংশ মাইতি, *ভারত ইতিহাস* (১৭০৭-১৯০৫খ্রিঃ) কলিকাতাঃ শ্রীদর প্রকাশনী, ১৯৯৫।
প্রেমময় দাশগুপ্ত, *ট্যাভনিয়ারের দেখা ভারত*, কলকাতাঃ ফর্মা কে এল এম প্রাইভেট, ১৯৮৪।
ফিলিপ কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, (জয়ন্তসিংহ ও অন্যান্য অনূদিত), কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মোগল যুগে স্ত্রী শিক্ষা*, কলকাতাঃপাল পাবলিসার্স, ১৩৪২।
বিনয় ঘোষ, *বাদশাহী আমল*, কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং কো. প্রাইভেট লি. ১৯৭৮।
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, *বাংলা পিডিয়া ১০ম খণ্ড*, ঢাকাঃ ২০০৩।
মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকাঃ জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, *ভারতে মুসলমান সভ্যতা*, কলকাতাঃ জাতীয়গ্রন্থ, ১৯১৪।
মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, *মোগল কুমারী*, কলকাতাঃ আবুল ফয়েজ এন্ড কোঃ, ১৩৪৩।
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *জেন্ডার ইস্যু, ও নারীর ক্ষমতায়ন*, ঢাকাঃ তরফদার প্রকাশনী, ২০১২।
মুসা আনসারী, *ইতিহাসঃ সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।
মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০০।
মুহাম্মদ ইনাম উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (১৯১২-১৯৭১), ঢাকাঃ সাহিত্যিক, ২০০৩।
মুহাম্মদ রুস্তম আলী, *উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।
মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস*, রাজশাহীঃ বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ১৯৭৩।
মনজুরুর রহমান, *বাংলা একাডেমী ঐতিহাসিক অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭।
মুস্তফা আস্-সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, (আকরাম ফারুক অনূদিত), ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮।
রুবেন লেভী, *সোসাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম*, গোলাম রসুল অনূদিত, কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫।
শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকাঃ ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৭৬।
শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম, *উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস* (আবে কাউসার), জুলফিকার আহমদ কিসমতি অনূদিত, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ২০০৪।
শাহনাজ কামাল, *মোগল মহলে*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।
শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল যুগের বেগম ও শাহজাদী*, ঢাকাঃ ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন, ১৯৬৪।
শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।
শিশু বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭।
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) *মোগল সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭।
সৈয়দ আমীর আলী, আরব জাতির ইতিহাস, (শেখ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪।
সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসে নারী শিক্ষা*, কলকাতাঃ পাল পাবলিসার্স, ২০০১।
সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, *মুঘল হারেমে*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৯।
সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, কলকাতাঃ মল্লিকা ব্রাদার্স, ১৯৮৭।
সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।
সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকাঃ ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪।

সাইফুল ইসলাম, *মোগল সম্রাটদের হেরেমে হারানো দিন*, ঢাকা: বর্তমান সময়, ২০০৪
সাযযাদ কাদির, *হারেমের কাহিনী জীবন ও যৌনতা*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৭।
সুলতান আহমদ, *ইতিহাস পরিভাষা কোষ*, রাজশাহী: তাসমিনা আহমদ, ২০০৪।
সতীশ চন্দ্র, *মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি*, কলিকাতা: কেপি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৪।
হ্যারল্ড ল্যাম্ব, *চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গল বাহিনী*, (নূর আহমেদ খান অনূদিত), ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪।
হ্যারল্ড ল্যাম্ব, *দিগ্বিজয়ী তাইমুর*, (আবুল কালাম শামসুদ্দীন অনূদিত), ঢাকা: রায়হান পাবলিশিং, ১৯৬৫।
হাসান আলী চৌধুরী, *বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৩।
হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডচিত্র*, ঢাকা: অ্যাডন পাবলিকেশন, ২০০৫।
হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮০।

ইংরেজী সহায়ক গ্রন্থ

Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, Calcutta, Asiatic Society of Bangal, (tr.) H. Bolochman, vol. 1, 1873 vol. 11 and 111 (tr.) H. S Jarret and Jadunath Sarkar, 1891 and 1894.
Abul Fazl, *Akbar Nama, (tr.)* H. Beveridge, Vol. 1, 11, 111, Calcutta: Asiatic Society of Bangal, 1907, 1912 and 1939.
Abdul Hamid Lohori, *Badshanama (2 Vols.)*. Ed. Kabir-ud-din Ahmad and Abdul Rahim, Calcutta: Bibliotheca Indica 1867, 1868.
Abdul Qadir Badauni, *Muntakhab-ut- Tawarikh Eng. (tr.)* S.A. Ranking, vol. I, W.H. Lowe vol. II, and Wolseley Haig, vol. III, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1895, 1924, 1924.
Beni Prasad, *History of Jahangir*, Allhabad: The Indian Press Publication Pvt. Ltd. 1962
Encyclopedia of Islam Vol. II, London: Luzac and Co. 1968.
F.G. Pearce, *An Outline History of Civilization*, Calcutta: Oxford University press, 1965.
Francisco Pelsaert, *Jahangir's India (tr.)* W. H. Moreland and P. Geyl, Delhi: Idarah-i- Adabiyat 1972.
Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire (1656-1668)*, revised by V. A Smith, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1983.
Ila Mukherjee, *Social Status of North Indian Woman*, Agra: Shiva Lal Agaswala and Company, 1972
Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, Allahabad: Indian Press, 1931

Jadunat Sarker, *A short History of Aurangzib* (1657-1707) New Delhi: M.C. Sarkar and Sons, 1979.
Jean Tavernier, *Travels in India (1640-1667) Vol. II, (tr.).* V. Ball, Vol. I, London: Macmillan & Co. 1889. William Crooke, Vol, II, London: Oxford University Press, 1925.
Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib.* (3 Vol.), Calcutta: Orient Longman, Ltd. 1912
Jadunath Sarkar, *Studies In Economic Life in Mughal India*, Delhi: Oriental Publishers And Distributors, 1975.
Jadunath Sarkars, *Studiesin Mughal India*, Calcutta: M.C. Sarkar and sons, 1919.
Jagdish Narain Sarkar, *Mughal Economy*, Culcutta:Naya Prokash, 1987
Jawaharlal Nehru, *Glimes of World History*, New Delhi: Oxford University press, 1983.
K. S. Lal, *The Mughal Harem*, New Delhi: Aditya Prakashan, 1988.
Lane Poole, *The Mohammaden Dynsties*, New York: Fredenick Ungar Publishing Co. 1965.
M.A. Ansari, *Social Life of the Mughal Emperors*, New Delhi: Gitanjali Publishing House, 1983.
Niccolo Manucci, *Storia Do Mogar*, (tr.) William Irvine, vol. I, 11, London: Jhon Murray, 1906.
Nur-Ud-Din Muhammad Jahangir, *Tuzak-I-Jahangir* (tr.) Alexander Rogers and Henry Beveridge (vol. II), Delhi: Low Press publication, 1989.
Percy Brown, *Indian Architecture*, (Islamic Periad). Bombay: D.B Taraporevala Sons and Co. Pvt. Ltd., 1981.
R.C Majumder, *An Advanced History of India*, Madras: Macmillan and Co. Ltd. 1986.
Rekha Misra, *Women In Mughal India* (1526-1748), Delhi: Oriental Publishers and Booksellers, 1967.
Richard Burn, *Cambridge. History of India* (Vol. 4) (The Mughal Period). Cambridge: University Press, 1937.
S Ram Sarma, *Women's Education In Ancient and Muslim Period*, New Delhi: Discovery Publishing House, 1996.
S.A.A Rizvi, *History of Shahjahan of Delhi*, Allahabad: The Indian Press Ltd. 1932.
Saqi Mustad Khan, *Maasir-I-Alamgiri* (tr.) Jadunath Sarkar, Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1947.
Soma Mukherjee, *Royal Mughal Ladies And their Contribution*, New Delhi: Gayan Publishing house, 2001.
V. Smith, *Akbar The Great Mogul (1542-1605)*, Delhi: S. Chand and Co. 1962
William Fostered, *Early Travels In India*, London: Oxford University Press, 1921.

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

এস. এম. শাহ্ আলম "মুঘল ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি ও ধারা (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ)" অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহীঃ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

মোঃ মাহফুজুর রহমান, "আরকানে ইসলামঃ প্রসার ও প্রভাব, ১৪৩০-১৭৮৫" অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহীঃ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাবি. ২০০৫।

মোঃ মামনুর রশিদ, "মোগল প্রাসাদ রাজনীতি (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ)" অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহীঃ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, "বাংলার সমাজে মুসলিম নারীঃ একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯০০-১৯৪৭)" অপ্রকাশিত পি.এইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহীঃ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাবি., ২০০২।

বাংলা প্রবন্ধ/ইংরেজী প্রবন্ধ/সাময়িকী

আব্দুর রহিম খাঁ, "বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মবস্থায় নারীর স্থান", *সওগাত*, ৫৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রাহয়ণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

ইন্দ্রানী মুখার্জী, "মুঘল হারেম-কয়েকটি নির্দেশনামা", *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৩, কলকাতাঃ ১৯৮৮।

নুসরাত ফাতেমা, "মোঘল হারেমে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার ধারা (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.)", *প্রবন্ধ সংকলন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।

নাজমা খান মজলিশ, "মোগল জেনানা মহলে নারীর বেশভূষার উৎস ও বিবর্তনের ধারা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ঢাকাঃ ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬ (চতুর্দশ খণ্ড)।

মো. মহিব্বুল ইসলাম, "রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্ট মুঘল মহীয়সীগণ", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসইটি পত্রিকা*, ঢাকাঃ ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৬।

মো. মহিব্বুল ইসলাম, মো. আতিয়ার রহমান, "মোগল হেরেমে সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির লালনঃ প্রসঙ্গ জেবউন নিসা" *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২য় সংখ্যা, ২০০১।

মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, "জিবুননেছা ও তাঁর প্রেম-উপখ্যান", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ*, রজত জয়ন্তী, ঢাকাঃ ১৯৯৩।

মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, "মুঘল বিদুষী গুলবদন বেগম", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ*, ঢাকাঃ ৩১ তম বর্ষ সংখ্যা - ১ম - ৩য়, বঙ্গাব্দ-১৪০৪।

মাহমুদ শামসুল হক, "মুঘল হারেমঃ অন্দরের ইতিবৃত্ত", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঈদসংখ্যা ২০০৭।
মায়া ভট্টাচার্য, "শতবর্ষ পূর্বে মুসলিম অন্তঃপুর বাসিনীদের বিদ্যাচর্চা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ষষ্ঠ বিংশ বর্ষ শ্রাবন-আশ্বিন, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ-সংখ্যা।
শিরিন মসাভী, "মুঘল ভারতে নারী শিক্ষা", অনুবাদ ও অনুলিখনঃ জাহানারা রায় চৌধুরী ও সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *ইতিহাসে নারী শিক্ষা*, কলকাতাঃ ২০০১।
সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, "শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ও রাজনীতিতে মুঘল নারী", *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ম সংখ্যা, ২০০২-২০০৩।
সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, "ইসলামে নারীর স্বাধীকার ও বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট", *গবেষণা পত্রিকা*, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯।
সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, "উদ্যান নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে উপমহাদেশীয় রমনীদের অবদান", *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, ১২শ সংখ্যা ১৪১১, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
Ammer Ali, The influence of Women in Islam, London: *Royal Asiatic Society*, 1899.
Syed Ameer Ali, Islamic Culture Under The Moguls, (Islamic Culture), *London: Royal Asiatic Society*, 1927.
Najma Khan Majlis, Woman Painters During the times of Emperor Jahangir (1605-1627 A.D), Dhaka: *Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXXI, No. 2 Dec. 1986.
Shireen Moosvi, Mughal Shipping at Surat In The First Half of 17th Century, *Calcutta: University*, 1990.

আলোকচিত্র

মোগল চিত্রকলায় হারেম



বয়স্ক নারীর উপস্থিতিতে হারেমে সুন্দর নারীর প্রতি ভালবাসা (১৭২০-২৫ খ্রিস্টাব্দ)।
জাতীয় জাদুঘর, নয়াদিল্লী



হারেমে প্রিয়জনের অপেক্ষায় শাহজাদী (১৮শ খ্রিস্টাব্দ)।
জাতীয় জাদুঘর, নয়াদিল্লী



হারেমের শয়ন কক্ষে শাহজাদা সেলিম (১৮ শ খ্রিস্টাব্দ)।

শাহজাদা ওয়েলস জাদুঘর, মুম্বাই



হারেমে শাহজাদীকে গোসল করানোর বিশেষ মুহূর্ত।
মানসিংহ জাদুঘর



মান্দুতে নূরজাহান কর্তৃক জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন (১৬১৮ খ্রিস্টাব্দ)
ফ্রিয়ার আর্ট গ্যালারী, ওয়াশিংটন



হারেমে শাহজাদার হলি খেলার দৃশ্য (১৭ শ খ্রিস্টাব্দ)।



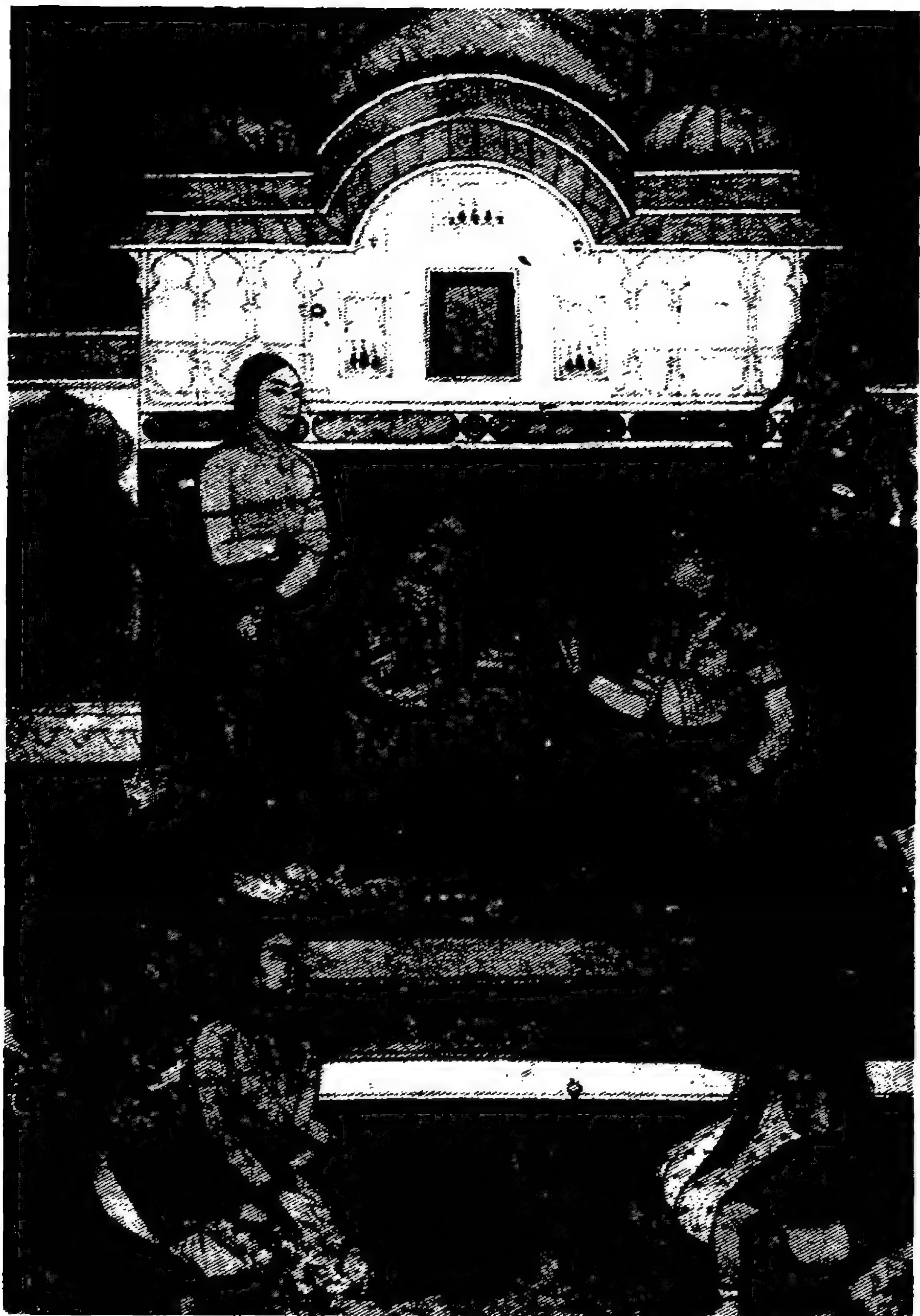
হারেমে প্রিয়তমার অপেক্ষায় শাহাজাদার অপেক্ষা (১৮ শ খ্রিস্টাব্দ)।
(সূত্রঃ কে.এস.লাল, দি মোগল হারেম)



হারেমে মহিলাদের ঝরকা দর্শন (১৭ শ খ্রিস্টাব্দ)।
শাহজাদা ওয়েলস মিউজিয়াম, মুম্বাই



হারেমে শাহজাদী গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করছেন (১৭ শ খ্রিস্টাব্দ)।
জাতীয় জাদুঘর, নয়াদিল্লী



হারেমে মহীয়সীদের পানীয় পানের দৃশ্য (১৭ শ খ্রিস্টাব্দ)।

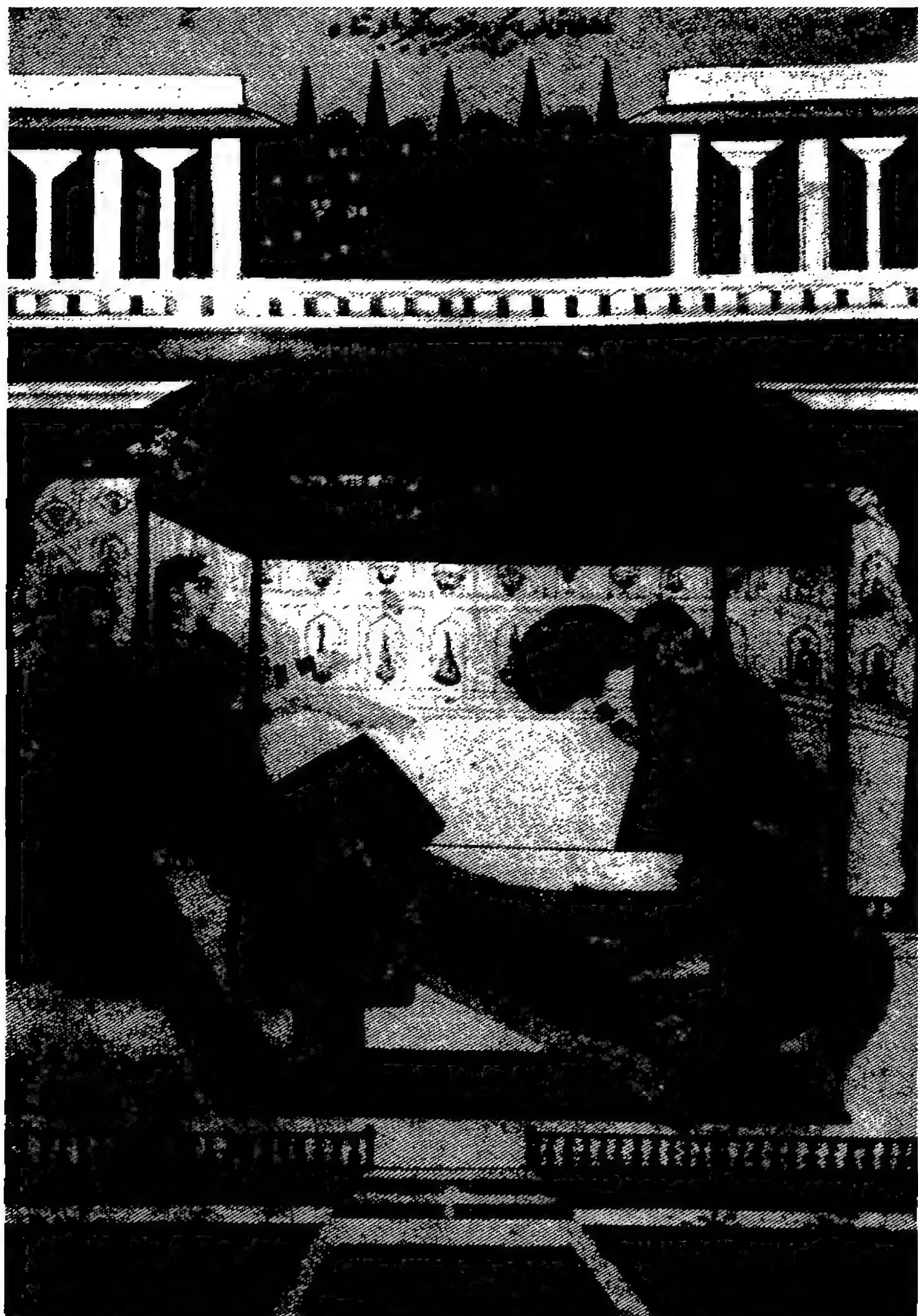
জাতীয় জাদুঘর, নয়াদিল্লী



শাহজাদা দারাশিকোর বিবাহের শোভাযাত্রায় সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ (১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ)।
ব্রিটিশ রয়েল লাইব্রেরী



শাহজাদা দারাশিকোর বিবাহের শোভাযাত্রা (১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ)।
নয়াদিল্লীর জাতীয় জাদুঘর



হারেমে শাহজাদী সুলতান-উন-নিসা বিশ্রামরত (১৮শ খ্রিস্টাব্দ)।

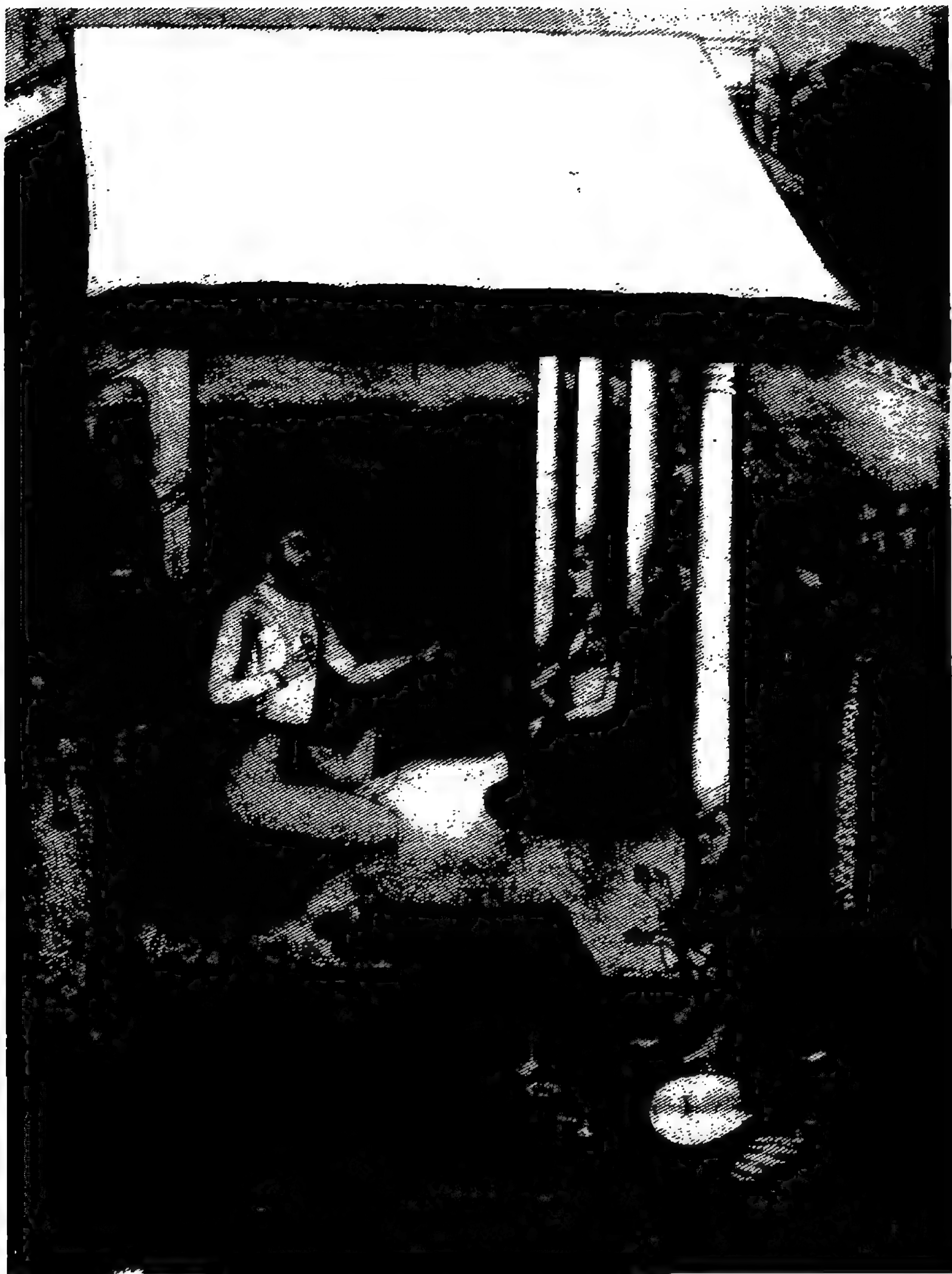
নয়াদিল্লীর জাতীয় জাদুঘর



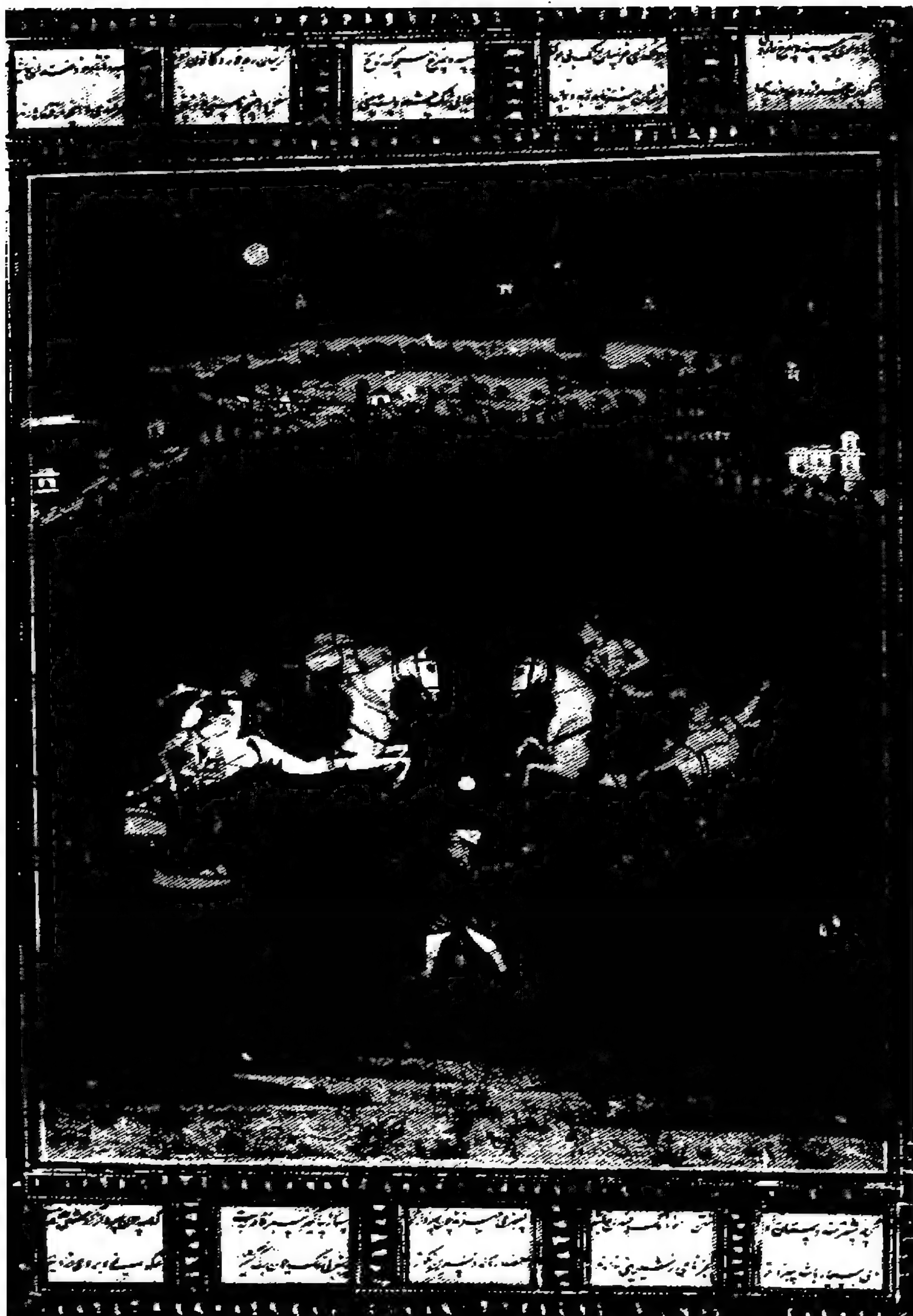
হারেমের উদ্যানে তাবুতে সম্রাট জাহাঙ্গীর মহীয়সীদের সঙ্গে আলাপরত (১৬০৫-১৬১০ খ্রিস্টাব্দ)।
জয়পুরের রাজা মানসিংহের জাদুঘর



হারেমে খোঁজাদের উপস্থিতিতে খোলা আকাশে মহীয়সীদের বিশ্রাম (১৭শ খ্রিস্টাব্দ)।
নয়াদিল্লীর জাতীয় জাদুঘর



হারেমে শাহজাদা মহীয়সী নারীর সঙ্গে গল্পরত (১৭ শ খ্রিস্টাব্দ)।
নয়াদিল্লীর জাতীয় জাদুঘর



হারেমে চাঁদ বিবির চৌগান বা পলো খেলার দৃশ্য(১৭ শ খ্রিস্টাব্দ)।

নয়াদিল্লীর জাতীয় জাদুঘর



হারেমে প্রেমিক যুগলের একটি বিশেষ মুহূর্ত।
মুম্বাই রাজপুত্র ওয়ালস জাদুঘর



হারেমে শাহজাদা মুরাদের জন্ম অনুষ্ঠান।
আকবারনামা



হারেমে শাহজাদীকে নাস্তা পরিবেশনের বিশেষ মুহূর্ত।



হারেমে মহীয়সীদের পুরস্কার অনুষ্ঠান।
ডাবলিনের ম্যানচেস্টার বিটি লাইব্রেরী

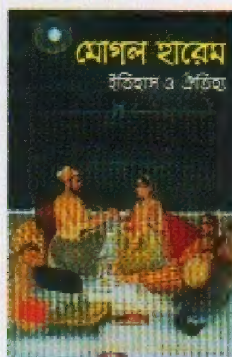


হারেমে শাহজাদীকে সংবাদ প্রদানের বিশেষ মূহুর্ত।

সূত্রঃ কে.এস.লাল, দি মোগল হারেম, জয়পুরের রাজা মানসিংহের জাদুঘর



হারেমের মহীয়সীদের সাথে ভালবাসার একটি বিশেষ মূহূর্ত।
ডাবলিনের ম্যানচেস্টার বিটি লাইব্রেরী



মোগল হারেম ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব



একটি পরিলেখ প্রকাশনা

